ছোটদের
বেতাল
পঁচিশ
লীলা মজুমদার

ছোটদের বেতাল বত্রিশ

লীলা মজুমদার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
অলংকরণ
অনুপ রায়
মুদ্রক
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
বই মেলা ১৯৮২
দ্বিতীয় মুদ্রণ
বই মেলা ১৯৮২
তৃতীয় মুদ্রণ
অক্টোবর ১৯৮২
আশ্বিন ১৩৮৯
চতুর্থ মুদ্রণ
মার্চ ১৯৮৩
ফাল্গুন ১৩৮৯
পঞ্চম মুদ্রণ
জুন ১৯৮৪
আষাঢ় ১৩৯১
ষষ্ঠ মুদ্রণ
নভেম্বর ১৯৮৬
কার্তিক ১৩৯৩

বারো টাকা
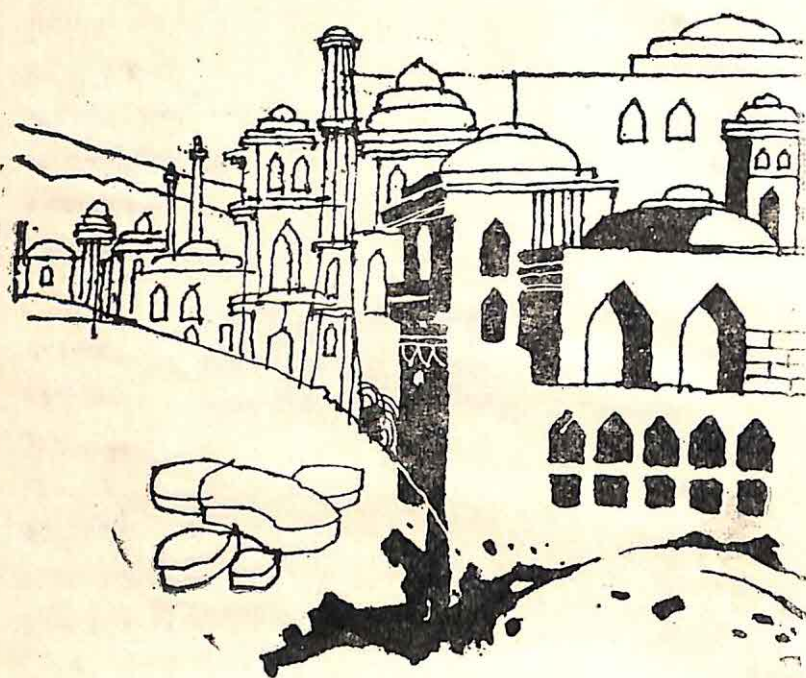
বড় সুন্দর শহর ছিল সেকালের উজ্জয়িনী নগর। ধনে-মানে, জ্ঞানে-গুণে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শৌর্যে-বীর্যে গমগম করত। সেখানে ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। এক লক্ষ যোজন জুড়ে তাঁর রাজ্য। এক যোজন হল চার ক্রোশ, এক ক্রোশ হল দু মাইল আর দু মাইল হল ৩$\frac{২}{৫}$ কিলোমিটার। তাহলে একবার ভেবে দেখ তাঁর রাজ্যটা কত বড় ছিল। সমস্ত জম্বুদ্বীপের তিনি ছিলেন রাজা।

পুরাণে আছে সাতটি দ্বীপ দিয়ে গড়া এই পৃথিবী। তারি একটি হল জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার অনেক দেশ। তার একটি আমাদের ভারতবর্ষ। এত বড় রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য। লোকে বলত তাঁর মতো রাজা আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি। যেমন জ্ঞানীগুণী, তেমনি সুন্দর চেহারা আর মনে সাহস, বাহুতে বল। অথচ তাঁর মতো দয়ালু ন্যায়বান রাজা আর ছিলো না। প্রজারা তাঁকে যেমন ভালোবাসত, তেমনি ভয়ও করত।

বিক্রমাদিত্যের বাবার নাম গন্ধর্বসেন। তিনি মারা গেলে, তাঁর বড় ছেলে শঙ্কু রাজা হলেন। মেজ ছেলে বিক্রমাদিত্য জ্ঞানী-গুণী হলেও, রাজা হবার তাঁর বড় বেশি ইচ্ছা। শেষে শঙ্কুকে মেরে তিনি রাজা হলেন।

অন্যায় করে সিংহাসনে চড়লেও, বিক্রমাদিত্যের মতো ভালো রাজা আর দেখা যায়নি। রাজা হয়েই তিনি চারদিকের অন্যান্য রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে, নিজের রাজ্যটিকে নিরাপদও করলেন, আবার অনেকখানি বাড়িয়েও নিলেন। রাজার ও তাঁর পারিষদদের অনেক ধন-রত্নও বাড়ল। হঠাৎ বিক্রমাদিত্যের

মনে হল, 'আমরা তো খুব সুখেই আছি, কিন্তু এই যে আমার লক্ষ লক্ষ প্রজা এরা কেমন আছে ? কে-ই বা এদের দেখাশুনো করে ? এরাও সুখী তো ? কি জানি কেউ যদি এদের ওপর অত্যাচার করে !'

রাজার তখন মনে হল নিজের চোখে একবার সমস্ত রাজ্যটাকে ঘুরে দেখা উচিত। দুঃখীদের দুঃখের কথা হয়তো তাঁর কান অবধি পৌঁছয় না। তবে রাজার বেশে গেলে হবে না। তাহলে সবাই সাবধান হয়ে যাবে, আসল অবস্থা জানা যাবে না। ছদ্মবেশে একা যেতে হবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ছোট ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে, সন্ন্যাসী সেজে পায়ে হেঁটে বিক্রমাদিত্য বেরিয়ে পড়লেন। দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে রাজা কত যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন, কত আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে চেনা হল, তার ঠিক নেই। এমন সময় খবর পেলেন যে স্ত্রীর সঙ্গে গোলমাল হওয়ার ফলে ভর্তৃহরি রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, বনে গিয়ে যোগসাধনা করছেন। উজ্জয়িনীতে রাজা নেই, রাজ্যের বড়ই দুরবস্থা।

এ-কথা শুনেই বিক্রমাদিত্যের মনে হল এখুনি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে, নিজের কর্তব্য নিজের হাতে নেওয়া উচিত। বহু দেশ পার হয়ে যখন ক্লান্ত শরীরে উজ্জয়িনীতে পৌঁছলেন, তখন মাঝরাত। নগরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় এক যক্ষ এসে পথ আটকাল। যক্ষরা দেবতা না হলেও, অনেকটা তাঁদের মতোই ছিল।

যক্ষ বলল, 'এ্যাই ! কোথায় যাচ্ছিস ? কি নাম তোর ?'

বিক্রমাদিত্য তো অবাক। 'আমি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য। তুমি কে ?'

যক্ষ বলল, 'তুই বিক্রমাদিত্য তার প্রমাণ কি ? দেবরাজ ইন্দ্র বলেছেন এখানে রাজা নেই, দেশে অরাজকতা। তুই যদি সত্যি বিক্রমাদিত্য হোস্, তাহলে যুদ্ধ দে। আমাকে হারাতে পারলে, তবে বুঝব তুই সত্যিই বিক্রমাদিত্য।'

তারপর দুজনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যক্ষ পারবে কেন ? দেখতে না দেখতে তিনি তাকে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে বুকে চেপে বসলেন।

তখন যক্ষ বলল, 'এবার বুঝলাম আপনি সত্যিই বিক্রমাদিত্য। দয়া করে যদি আমাকে ছেড়ে দেন, তাহলে আমি আপনার প্রাণ বাঁচাব।'

রাজার বেজায় হাসি পেল। যক্ষ বলে কি! যে কোনো সময়ে তিনি ওর প্রাণ নিতে পারেন আর ও বলে কি না ওঁর প্রাণ বাঁচাবে!

এ-কথা শুনে যক্ষ বলল, 'আগে আমার যা বলবার আছে সব শুনুন। তারপর কথা মতো কাজ করলে, বহুকাল সুখে রাজত্ব করতে পারবেন, নইলে আপনার সর্বনাশ হবে।'

যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়ে রাজা বললেন, 'বল কি বলবে।'

যক্ষ তখন এক আশ্চর্য গল্প বলল।

যক্ষ বলল, সেকালে ভোগবতী নগরের রাজা চন্দ্রভানু একদিন শিকারের আশায় গভীর বনে গিয়ে দেখলেন একজন অদ্ভুত তপস্বী মাথা নিচের দিকে, পা উপর দিকে করে গাছের ডালে ঝুলে আছেন। চোখ বোজা, কথাটথা বলছেন না। কাছাকাছি গাঁয়ের লোকদের কাছে শুনলেন সন্ন্যাসী বহুকাল ঐ ভাবে ঝুলে তপস্যা করছেন, কিছু খান-ও না, কথা-ও বলেন না।

পরদিন সভায় বসে চন্দ্রভানু বললেন, কেউ যদি ঐ সন্ন্যাসীকে কোনো উপায়ে রাজার সভায় নিয়ে আসতে পারে, তিনি তাকে এক লাখ টাকা দেবেন।

ঐ নগরে একজন মেয়ে ব্যবসা-ট্যাবসা করত। সে এসে রাজাকে বলল, 'আমি যদি বনে গিয়ে ঐ সন্ন্যাসীকে গাছ থেকে নামিয়ে, তাঁকে বিয়ে করে ছেলে সুদ্ধ এখানে আনতে পারি, আমাকেও লাখ টাকা দেবেন তো?'

রাজা যখন বললেন নিশ্চয় দেবেন, তখন মেয়েটি বনে চলে গেল। তপস্বীকে দেখে তার মনে হল এঁর শরীর এত রোগা, হঠাৎ জাগিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সে তখন কাছেই একটি সুন্দর কুটির তৈরি করে, সেখানে বাস করতে লাগল। রোজ একটু মোহনভোগ রেঁধে সে তপস্বীর মুখে দিত। সমাধির ঘোরেও তিনি একটু একটু করে সবটা খেয়ে নিতেন।

কয়েক দিন এ ভাবে চললে পর, তপস্বী গায়ে জোর পেলেন, চোখ মেলে চাইলেন। তারপর গাছ থেকে নেমে মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি কে?' মেয়েটি বলল, 'আমি দেবকন্যা, তীর্থে বেরিয়েছি। আপনাকে দেখে মনে পড়ল তপস্বীদের সেবা করলে পুণ্য হয়। তাই ঘর তৈরি করে এখানে আছি। আপনার সেবা-যত্ন করতে পারলে আমি ধন্য হব।'

সেবা-যত্ন পেয়ে, সাধু বড়ই খুশি হয়ে মেয়েটিকে বিয়ে করে ঐ কুটিরে থেকে গেলেন। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তাঁদের একটি সুন্দর ছেলে হল। তারপর একদিন মেয়েটি তপস্বীকে বলল, 'এ ভাবে সাংসারিক সুখে ডুবে থাকা ঠিক নয়। আমরা তীর্থ করতে যাই না কেন?'

তপস্বীও তখনি রাজি হয়ে, ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রওনা হলেন।

এইভাবে তাঁরা যখন রাজসভার কাছাকাছি এলেন, দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে, আশ্চর্য হয়ে চন্দ্রভানু তাঁর সভাসদদের বললেন, 'দেখ, দেখ, সেই মেয়ে তার কথা রেখেছে। সাধুর তপস্যা ভাঙিয়ে, তাঁকে বিয়ে করে, ছেলে সুদ্ধ এনে হাজির করেছে। ওর বুদ্ধি দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। ওকে লাখ টাকা দেওয়া হোক।'

এই কথা তপস্বীর কানে যাওয়া মাত্র তাঁর চোখ ফুটল। ছেলেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, তিনি তখনি সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজার চালাকি আর স্ত্রীর ছলনায় রাগে দুঃখে তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন এই রাজার উপর প্রতিশোধ নেবেন।

এই মনে করে যোগী আরো গভীর বনে গিয়ে আরো কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর নানা রকম ক্ষমতা হল। শেষ পর্যন্ত তিনি চন্দ্রভানুর মৃত্যু ঘটালেন।

এইখানে গল্প শেষ করে, যক্ষ বলল, 'মহারাজ, তুমি, ঐ যোগী আর রাজা চন্দ্রভানু, তিনজন একই নগরে, একই সময়ে, একই নক্ষত্রে জন্মেছিলে। যোগী কুমোরের ছেলে হয়েও, যোগবলে অনেক ক্ষমতা লাভ করেছে। চন্দ্রভানু তেলীর ছেলে হয়েও রাজা হয়েছিল। তাকে কুমোর

হত্যা করে, যোগবলে তার প্রেতকে বেতাল বানিয়ে একটা শশ্মানের শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এদিকে আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হয়েছেন বলে আপনারও প্রাণ নেবার চেষ্টায় আছে। এই আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়ে, আপনার প্রাণ বাঁচাবার উপায় করে দিলাম।'

এই বলে যক্ষও চলে গেল, বিক্রমাদিত্যও রাজবাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে সকলে আহ্লাদে আটখানা। এরপর রাজা তাঁর কাজের ভার হাতে তুলে নিয়ে উচিত ভাবে প্রজা পালন করতে লাগলেন।

কিছুদিন কেটে যাবার পর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে একজন সন্ন্যাসী এলেন। তাঁর নাম শান্তশীল। রাজা তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে বসতে দিলেন। একটুক্ষণ কথা বলে, রাজার হাতে একটা বেল দিয়ে, তাঁকে আশীর্বাদ করে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। রাজার বারবার মনে হতে লাগল, যক্ষ যে যোগীর সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল, ইনি সেই যোগী নয় তো? শেষ পর্যন্ত বেলটি না খেয়ে রাজকোষে যত্ন করে রেখে দিলেন।

এরপর থেকে সন্ন্যাসী রোজ এসে রাজাকে একটি করে বেল দিয়ে আশীর্বাদ করে যেতেন। সব বেল রাজকোষে রেখে দেওয়া হত। একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিক্রমাদিত্য তাঁর ঘোড়াশালা দেখতে গিয়েছেন, সন্ন্যাসীও সেইখানে গিয়ে বেল দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। দেবার সময় দৈবাৎ বেলটা মাটিতে পড়ে ফেটে গেল। আর তার মধ্য থেকে একটি উজ্জ্বল রত্ন বেরিয়ে পড়ল। রাজা তো অবাক।

তখন সন্ন্যাসী বললেন, 'রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ আর চিকিৎসকের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। তাই বেল নিয়ে আসি। প্রত্যেকটিরই ভিতরে একটি করে রত্ন আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে সব বেল ভাঙা হল। প্রত্যেকটির মধ্যে একটা করে চমৎকার রত্ন পাওয়া গেল। তারপর এক সাধু জহুরীকে ডেকে রত্নগুলোর দাম যাচাই করা হল। জহুরী যত্ন করে রত্ন পরীক্ষা করে বলল, 'এ-সব অমূল্য রত্ন। কোটি কোটি টাকা দিলেও এমন একটি

পাওয়া যাবে না।'

রাজা তখন স্তম্ভিত হয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এ রত্ন কোথায় পেলেন? কেনই বা আমাকে দিচ্ছেন?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'সব কথা সবাইকে বলতে নেই। আর আমি কেন আপনাকে রত্ন দিয়েছি, সে-কথা গোপনে বলব।'

রাজা তাঁকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমাকে এত দামী জিনিস দিলেন, অথচ কোনোদিনও আমার বাড়িতে জলস্পর্শ করলেন না। বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি? আমি প্রাণ দিয়ে আপনার আদেশ পালন করব।'

তখন সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি গোদাবরী নদীর তীরের শ্মশানে সাধনা করে অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে চাই। তাহলে আমি সবরকম শক্তির অধিকারী হব। তুমি আগামী ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সন্ধ্যা বেলায় সেখানে আমার আশ্রমে যাবে। একলা যাবে আর সেখানে রাত কাটাবে। আমি যা যা বলব, সব কিন্তু তোমাকে পালন করতে হবে।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি, ঐ সময় আপনার কাছে উপস্থিত হব।'

সন্ন্যাসী তাঁকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর সন্ধ্যা এল। বিক্রমাদিত্যও যথা সময়ে, হাতে একটি তলোয়ার নিয়ে একলা সেই আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন।

সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে, দু হাতে দুটি মানুষের খুলি নিয়ে করতালের মতো বাজাচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে এক দল বিকট চেহারার ভূত-প্রেত পিশাচ ডাকিনী ইত্যাদি আনন্দে নাচছে। এ-সব সামান্য জিনিস দেখে এতটুকু ভয় না পেয়ে, বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনার দাস উপস্থিত। বলুন কি করতে হবে।'

যোগী তাঁকে আশীর্বাদ করে, আসন দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমার ব্যবহারে বড়ই খুশি হয়েছি। এখান থেকে দু

ক্রোশ দূরে একটা শশ্মান আছে। সেখানে একটা মস্ত শিরীষ গাছ আছে। ঐ গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। সেই মড়াটা আমার দরকার। তুমি তাকে গাছ থেকে নামিয়ে, এখানে নিয়ে এসো।' রাজাও 'যে আজ্ঞা!' বলে রওনা হলেন, সন্ন্যাসীও পুজোর আসনে বসলেন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার অমাবস্যার রাত। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিক্রমাদিত্য বড় বড় পা ফেলে শ্মশানের দিকে চললেন। মনে হল চারদিকে ভূত-প্রেতরা চেঁচামেচি করছে। কিন্তু রাজার মনে ভয়-ডর বলে কিছু ছিল না। তিনি গিয়ে শ্মশানে পৌঁছলেন।

সে বীভৎস জায়গার কথা মুখে বলা যায় না। শিরীষ গাছটার শিকড় থেকে মগ-ডাল পর্যন্ত ধক্-ধক্ করে আগুন জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখা গেল বিকট চেহারার পিশাচ-পিশাচীরা মড়া চিবিয়ে খাচ্ছে আর ভীষণ গণ্ডগোল করছে।

ভয় কাকে বলে বিক্রমাদিত্য জানতেন না। তিনি শিরীষ গাছের আরো কাছে গিয়ে দেখলেন, গাছের ডালে মুণ্ড মাটির দিকে, ঠ্যাং আকাশের দিকে করে দড়ি-বাঁধা একটা মড়া ঝুলছে। এটাকেই নিয়ে যেতে হবে।

তর-তর করে গাছে চড়ে, নিজের কোমর থেকে খড়্গ বের করে, তাই দিয়ে রাজা মড়ার পায়ের দড়ি কেটে দিলেন। ঝুপ করে সে নীচে পড়েই চিৎকার করে কান্না জুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাজাও নেমে এলেন। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তিনি মড়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? তোমার এমন দশা কেন?'

তাই শুনে মড়া খিলখিল করে হাসতে লাগল। রাজা তো একেবারে হতভম্ব। সেই সুযোগে মড়াটা নিজেই সুড়সুড় করে আবার গাছে চড়ে আগের মতো ঝুলে রইল। রাজাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনিও আবার গাছে উঠে, আবার দড়ি কেটে তাকে নীচে ফেললেন।

এবার সে চুপ করে পড়ে রইল। রাজা নেমে এসে নরম গলায় তাকে তার এই দুরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে কোনো উত্তর দিল না।

তখন রাজার মনে হল এ-ই হয়তো সেই তেলী রাজা চন্দ্রভানু, যার

কথা যক্ষ বলেছিল। তাহলে ঐ যোগীও নিশ্চয় সেই কুমোর, যিনি চন্দ্রভানুর প্রাণ নেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

সে যাই হোক, নিজের গায়ের চাদর দিয়ে মড়াটাকে বেশ করে বেঁধে কাঁধে তুলে রাজা রওনা দিলেন।

এদিকে মড়ার মধ্যে যে বেতাল, অর্থাৎ প্রেত, বন্ধ ছিল সে হঠাৎ কথা বলল। 'ওহে বীরপুরুষ, তুমি কে ? আমাকে কোথায় আর কেন নিয়ে যাচ্ছ ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক যোগী তোমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে বলেছেন, তাই নিয়ে যাচ্ছি।'

বেতাল বলল, 'খালি মূর্খরা, বোকারা আর কুঁড়েরা মুখ বুজে পথ চলে। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তারা নানারকম ভালো কাজ করতে করতে আর ভালো কথা বলতে বলতে পথ পার হয়। আমিও তোমাকে কয়েকটা গল্প বলব। প্রত্যেক গল্প শেষ করে, একটা করে প্রশ্ন করব। যদি তার ঠিক ঠিক উত্তর না দাও, তাহলে কিন্তু তুমি বুক ফেটে মরে যাবে।'

রাজা আর কোনো উপায় না দেখে বললেন, 'বেশ, তাই বল।' বলে মড়া কাঁধে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে পা বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বেতালও তার প্রথম গল্প আরম্ভ করল।

১ম গল্প

সেকালে বারাণসীতে প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে বজ্রমুকুট ছিলেন মা-বাপের চোখের মণি।

একদিন রাজকুমার মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে ঘন বনে গেলেন শিকার করতে। একসময় একলা ঘুরতে ঘুরতে বনের মাঝখানে তিনি একটা হ্রদের ধারে পৌঁছলেন। বড় সুন্দর জায়গা। হাঁস, বক আর অন্য জলচর পাখিরা সেখানে খেলা করে বেড়াচ্ছে। টলটলে জলে পদ্মফুল দুলছে, সুগন্ধ ছুটছে, মৌমাছি উড়ছে। হ্রদের ধারে ফুলের গাছ, ফলের গাছ, পাখিরা গান গাইছে। গাছের নীচে শীতল ছায়া দেখলেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

রাজকুমার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বকুল গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধলেন। কাছেই শিব-মন্দির দেখে তিনি হ্রদের জলে স্নান করে,

দেব দর্শন করে, পূজো করতে বসলেন। পূজো শেষ করে বেরিয়ে এসেই একজন রূপসী রাজকুমারীকে দেখতে পেলেন।

রাজকন্যাও সখীদের সঙ্গে স্নান আর পূজো সেরে, গাছতলায় বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে দেখে বজ্রমুকুট মুগ্ধ হলেন। রাজকুমারী তখন নিজের খোঁপা থেকে একটা পদ্মফুল খুলে হাতে নিলেন। তারপর ফুলটি কানে পরলেন। তারপর কান থেকে খুলে দাঁতে কাটালেন ; তারপর মাটিতে ফেলে দিলেন। চলে যাবার আগে পদ্মফুলটিকে কুড়িয়ে বুকে রাখলেন।

বজ্রমুকুট আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন, এ-সবের কোনো মানে বুঝলেন

না। কিন্তু রাজকুমারীকে তাঁর বড়ই ভালো লাগল। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর কাছে সব কথা খুলে বললেন। মন্ত্রিপুত্রও সব শুনে বজ্রমুকুটকে

তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন।

বাড়ি ফিরে রাজকুমারের কাজকর্ম, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলো,

খাওয়া-দাওয়া, কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না। তিনি বুঝতে পারলেন যে ঐ অচেনা কন্যাকে বিয়ে না করলে, তিনি কখনো সুখী হতে পারবেন না। অথচ তার নামধাম কিছুই জানা নেই, কোথায় তাকে খুঁজে পাবেন? দিনে দিনে বজ্রমুকুটের চেহারা খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

এদিকে তাঁর জন্য মন্ত্রিপুত্রের বড়ই দুর্ভাবনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ রাজকন্যা কি চলে যাবার সময়ও কিছুই বলে যাননি?' বজ্রমুকুট তখন সেই পদ্মফুলের কথা বললেন। শুনে বন্ধু কি খুশি! 'তাহলে তো সব-ই জানা গেল। আর ভাবনা নেই। শোন বলি, মাথা থেকে ফুল নিয়ে কানে পরার মানে উনি কর্ণাট নগরে থাকেন। দাঁতে ফুল কাটার মানে উনি দন্তবাট রাজার মেয়ে। মাটিতে ফুল ছুঁড়ে ফেলার মানে ওঁর নাম পদ্মাবতী। আর বুকে ফুল তুলে নেওয়ার মানে উনি তোমাকে ভালোবাসেন।'

তখনি রাজপুত্র মন ঠিক করে ফেলে বন্ধুর সঙ্গে কর্ণাট নগরের দিকে রওনা হলেন। দুজনেই উপযুক্ত পোশাক পরে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চললেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন রাজবাড়ির কাছে এক কুঁড়েঘর। তার দোরগোড়ায় এক বুড়ি বসে আছে। ওঁরা তাকে বললেন, 'মা, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি, একটু থাকবার জায়গা দিতে পার?' বুড়ি তাঁদের সুন্দর চেহারা দেখে আর মিষ্টি কথা শুনে গলে গিয়ে বলল, 'আমার বাড়িতেই তোমরা যত দিন ইচ্ছা থেকো।'

আস্তে আস্তে তাঁরা বুড়িকে তার পরিচয়, কি করে সংসার চলে এইসব জিজ্ঞাসা করে শুনলেন যে বুড়ির ছেলে রাজবাড়িতে চাকরি করে। বুড়ি নিজেও এক সময় রাজকুমারী পদ্মাবতীর ধাইমা ছিলেন। রাজকুমারী তাকে বড় ভালোবাসেন। রাজা তাকে খেতে পরতে দেন। তিনি বড় দয়ালু। বুড়ি রোজ রাজবাড়ি গিয়ে পদ্মাবতীকে দেখে আসে।

বজ্রমুকুট বললেন, 'তাহলে কাল যখন যাবে, তাঁকে বল হ্রদের তীরে তিনি যে রাজকুমারকে দেখেছিলেন, সে তাঁর ফুলের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, এখানে এসেছে।'

এ কথা শোনামাত্র লাঠি হাতে বুড়ি রওনা দিল। রাজকন্যাকে একা পেয়ে বুড়ি বলতে লাগল, 'বাছা, ছোটবেলা থেকে তোমাকে মানুষ করেছি। বড় আশা করে আছি কোনো সুপাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। আমার বাড়িতে যে রাজপুত্র এসেছেন, তিনি সব দিক দিয়ে তোমার উপযুক্ত। তাছাড়া হ্রদের তীরে তুমি তাঁকে দেখেওছ।'

এ কথা শুনে চটে গিয়ে দু হাতে চন্দন মাখিয়ে রাজকন্যা বুড়ি বেচারির দু গালে চড় মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। মনের দুঃখে বুড়ি রাজকুমারকে সব কথা বলল। শুনে রাজকুমারও হতাশ হয়ে বন্ধুকে বললেন, 'বন্ধু, আর কেন? আমি তো কোনো আশা দেখছি না।'

মন্ত্রিপুত্র বললেন, 'আমি কিন্তু দেখছি। অত ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। বুড়িমার গালে চন্দনের দশটি আঙুলের ছাপের মানে হল আর দশ দিন পরে শুক্লপক্ষের শেষ, তার পরেই তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।'

দশ দিন বাদে বুড়ি আবার পদ্মাবতীর কাছে গিয়ে রাজকুমারের কথা বলল। এবার রাজকন্যা তাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে অন্দরমহলের খিড়কি দোর দিয়ে বের করে দিলেন। সেও গিয়ে বজ্রমুকুটকে সব কথা বলল। শুনে হতাশায় রাজকুমার ভেঙে পড়লেন। মন্ত্রিপুত্র কিন্তু অন্য মানে করলেন, 'আর ভাবনা নেই। রাজকুমারী তোমাকে আজ রাতে খিড়কি দোর দিয়ে অন্দরে যেতে বলেছিলেন।'

সেই রাতে বন্ধুকে নিয়ে বজ্রমুকুট রাজবাড়ির খিড়কি-দোরে পৌঁছলেন। বন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, রাজকুমার ভিতরে গেলেন। রাজকুমারী সেজেগুজে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সখীরা অন্তঃপুরের ঘর-দোর চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছিল। তাদের সাক্ষী রেখে সেই রাতেই গান্ধর্ব মতে দুজনার বিয়ে হয়ে গেল। আনন্দ উৎসবে রাত কাটল। সকালে যখন বজ্রমুকুট অন্তঃপুর থেকে বেরোতে যাবেন, রাজকুমারী কিছুতেই তাঁকে ছাড়লেন না। বন্ধুর কথা ভুলে গিয়ে আমোদ আহ্লাদে রাজপুত্র প্রায় এক মাস কাটিয়ে দিলেন।

হঠাৎ একদিন তাঁর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। তিনি রাজকুমারীর

কাছে সব কথা বললেন, যে বুদ্ধিমান বন্ধুর জন্যেই রাজকুমারীকে তিনি খুঁজে পেলেন, শেষটা তাকেই ভুলে গেলেন, এমন নরাধম তিনি !!

পদ্মাবতী বললেন, 'খুব অন্যায় করেছ। আমি তাঁর জন্য মিষ্টি তৈরি করে একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি এখনি গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে এসো।'

বজ্রমুকুট তখনি খিড়কি-দোর দিয়ে বেরিয়ে বুড়ির বাড়ি গেলেন। সেখানে এত দিন পরে বন্ধুকে দেখে তাঁর চোখে জল এল। তিনি তাঁকে নিজের সৌভাগ্যের কথা বললেন। এমন সময় রাজকন্যার দাসী মিষ্টি দিয়ে গেল। মন্ত্রিপুত্র অবাক হয়ে বললেন, 'এ সব কি?' রাজপুত্র বললেন, 'আমার স্ত্রী তোমার জন্য মিষ্টি তৈরি করে পাঠিয়েছেন। বলেছেন অন্তত একটি মিষ্টি তোমাকে না খাইয়ে যেন ফিরে না যাই।'

মন্ত্রিপুত্র তখন বড় দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু এতে যে বিষ মাখানো আছে। পাছে আমি তোমাকে দেশে ফিরে যেতে বলি, তাই রাজকুমারী আমাকে মেরে ফেলতে চান।'

শুনে রাগে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে রাজকুমার উঠে পড়লেন, 'বেশ, এখনি তার পরীক্ষা হয়ে যাক।' বলে একটা বেড়ালকে একটি লাড্ডু খেতে দিলেন। লাড্ডু খাওয়ামাত্র বেড়ালটা মরে গেল।

রাজকুমার তখন একেবারে ভেঙে পড়লেন, 'এমন পাপিষ্ঠার আর আমি মুখ দেখবো না। চল, আমরা দেশে ফিরে যাই।'

মন্ত্রিপুত্র বললেন, 'না, ও ভাবে কাজ করে কোনো লাভ হবে না। তুমি বরং ফিরে গিয়ে পদ্মাবতীকে বল যে মিঠাই খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ওকে কিছুই জানতে দিও না। রোজকার মতো খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদের পর রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়লে, তুমি ওঁর গায়ের সব গয়না আস্তে আস্তে খুলে একটা পুঁটলি বাঁধো। তারপর তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়ে চলে এসো।'

রাজকুমার তাই করলেন। ভোরে মন্ত্রিপুত্র যোগী সেজে একটা শ্মশানে আশ্রয় নিলেন। আর বজ্রমুকুটকে শিষ্য সাজিয়ে বললেন, 'এই গয়নাগুলো নিয়ে রাজবাড়ির কাছে কোনো ভালো স্যাকরার কাছে বিক্রি

করে এসো। যদি কেউ রাজকুমারীর গয়না চিনতে পেরে, চোর বলে তোমাকে ধরে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

হলও ঠিক তাই। স্যাকরা গয়না দেখেই চিনতে পারল এ-সব তারই হাতে গড়া, পদ্মাবতীর জিনিস। তার চেঁচামেচি শুনে অনেক লোকজন জড়ো হল। শেষ অবধি নগরপাল এসে দুজনকে বন্দী করল। শিষ্য-বেশী রাজকুমার বারবার বলতে লাগলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার গুরুদেব এগুলো বেচে দিতে বলেছেন। চলুন তাঁর কাছে!' তখন নগরপাল শ্মশানে গিয়ে গুরুকেও গ্রেপ্তার করে স্বয়ং রাজার কাছে দুজনকে নিয়ে গেল।

রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ-সব তুমি কোথায় পেলে?'

যোগীর ছদ্মবেশে মন্ত্রিপুত্র বললেন, 'মহারাজ, আমি ডাকিনী-মন্ত্র রপ্ত করেছি। এক ডাকিনী এসে নিজের গা থেকে এ গয়না খুলে দিয়েছে। প্রমাণ-স্বরূপ আমি তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের দাগ দিয়েছি।'

রাজা তখুনি অন্দরমহলে গিয়ে রানীকে বললেন, 'দেখ তো পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে ত্রিশূলের দাগ আছে কি না।'

রানী ফিরে এসে বললেন, 'আছে।'

তখন রাগে দুঃখে অন্ধ হয়ে রাজা বললেন, 'এই পাপিষ্ঠাকে কি সাজা দেব? প্রাণদণ্ড, না নির্বাসন?'

যোগী বললেন, 'মেয়েদের মারতে হয় না। নির্বাসন দিন।'

তারপর রাজার হুকুমে পদ্মাবতীকে পালকি করে ঘোর বনের মধ্যে রেখে আসা হল।

এদিকে মন্ত্রিপুত্রও বজ্রমুকুটকে সঙ্গে নিয়ে একটু পরেই রাজকুমারীকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত হলেন। পদ্মাবতী ভয়ে ভাবনায় কাতর হয়ে একটা গাছতলায় বসে কাঁদছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করে, রাজপুত্রের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তারা দেশের পথ ধরলেন।

সেখানে পৌঁছালে রাজধানীতে আনন্দ উৎসব পড়ে গেল। রাজা-রানীও এতদিন পরে ছেলে-বৌকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হলেন।

এই ভাবে প্রথম গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'মহারাজ, এবার বল,

পদ্মাবতী, তাঁর বাবা দন্তবাট আর মন্ত্রিপুত্র এঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে অন্যায় করেছিল ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দন্তবাট !'

'কেন ?'

কারণ পদ্মাবতী মন্ত্রিপুত্রকে শত্রু মনে করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন। শত্রু মারায় দোষ হয় না। মন্ত্রিপুত্রও পদ্মাবতীকে শত্রু ভেবেছিলেন, তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করায় তাঁর কোনো দোষ হয়নি। কিন্তু দন্তবাট রাজা ন্যায়-বিচার ভুলে, বাপ হয়ে স্নেহ ভুলে, বিনা প্রমাণে মেয়েকে নির্বাসন দিলেন।'

এই রকম উপযুক্ত উত্তর পেয়ে বেতাল তখুনি শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার গাছে ঝুলে পড়ল। রাজাও তার পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে, আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে, কাঁধে তুলে, আশ্রমের দিকে রওনা দিলেন।

বেতাল বলল, 'তাহলে দ্বিতীয় গল্প শোন, মহারাজ—'

২য় গল্প

সেকালে যমুনা নদীর ধারে জয়স্থল নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে কেশব শর্মা বলে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ থাকতেন। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের নাম মধুমালতী, দেখতে যেন রূপের ডালি। ক্রমে তার বিয়ের বয়স হলে, ব্রাহ্মণ আর তাঁর ছেলে চারদিকে একজন ভালো পাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ গেছেন কোনো যজমানের ছেলের বিয়েতে ; তাঁর ছেলেও গেছে লেখাপড়ার জন্য গুরুর বাড়িতে। এমন সময় ত্রিবিক্রম বলে এক ব্রাহ্মণের ছেলে কেশবের বাড়িতে এল। ঘরে শুধু মধুমালতী আর তার মা। কিন্তু ছেলেটি দেখতে-শুনতেও যেমন ভালো, তার ব্যবহারও তেমনি মিষ্টি। তার উপর তার সঙ্গে কথা বলে কেশবের স্ত্রী বুঝলেন ওদের বংশও ভালো, ছেলেটির জ্ঞান-বিদ্যাও যথেষ্ট। তাঁর মনে হল এর

সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হলে বড় ভালো হয়। বিয়ের কথা পেড়েও দেখলেন ব্রাহ্মণী। অমন সুন্দর, লক্ষ্মী মেয়ে বিয়ে করতে ত্রিবিক্রমের আগ্রহের অভাব নেই। এখন কেশব ফিরলেই সম্বন্ধটা পাকা হয়।

কয়েকদিন পরেই কেশব আর তাঁর ছেলে দুজনেই এসে উপস্থিত। এখন মুশকিল হল যে তাঁদের সঙ্গেও একটি করে পাত্র। তাদের নাম বামন আর মধুসূদন। তিন পাত্রই রূপে, গুণে, বিদ্যায়, অবস্থায়, বংশ-মর্যাদায় সমান। কেশব মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। কি করা যায় ভাবছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—

'ওগো, তোমরা কিসের ভাবনা করছ? এদিকে সাপের কামড়ে যে মধুমালতীর প্রাণ যায়!'

এ কি সর্বনাশ হল! কেশব তাঁর ছেলে আর পাত্ররা ছুটোছুটি করে কাছাকাছি যত বিষ-বৈদ্য ছিলেন, সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁরাও কম চেষ্টা করলেন না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষটা তাঁরা বললেন যে এ মেয়েকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, এর যাবার সময় হয়েছে।

হলও তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই মধুমালতী শেষ নিশ্বাস ফেলল। সকলে শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কেশব, তাঁর ছেলে আর পাত্ররা এক সঙ্গে মিলে মধুমালতীর শেষ কাজগুলো করলেন। যমুনার তীরে সোনার প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কেশব আর তাঁর ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলেন।

পাত্ররা তিনজন তখনি চলে গেল না। ত্রিবিক্রম নিবে যাওয়া চিতা থেকে অস্থি কুড়িয়ে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে একটা ঘরের কোণায় ফেলে রেখে, দেশে ঘুরতে বেরোল। বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থ করতে গেল। মধুসূদন ঐ শ্মশানের এক কোণে একটা পাতার কুঁড়ে বানিয়ে চিতা থেকে ছাইগুলো জড়ো করে এনে কুঁড়েঘরে যত্ন করে রেখে, যোগাভ্যাস করতে লাগল।

এদিকে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বামন একদিন দুপুর বেলায় এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। ব্রাহ্মণ তাকে অনেক আদর

আপ্যায়ন করে, দুপুরে খেয়ে যেতে বললেন। রান্নাঘরের এক ধারে ব্রাহ্মণী রান্না করছেন, অন্য দিকে বামন খেতে বসেছে। ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেটা এদিকে মাকে মহা জ্বালাতন করতে আরম্ভ করে দিল। শেষ পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে মা ছেলেটাকে ধরে জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিলেন। দেখতে দেখতে ছেলেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বামনের তো চক্ষুস্থির। এও কি সম্ভব! হাত থেকে ভাতের গ্রাস পাতে পড়ে গেল। তাই দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, 'কি হল? খাওয়া বন্ধ করলেন কেন?'

বামন বলল, 'যেখানে এমন রাক্ষুসে ব্যবহার চলে সেখানে খাই কি করে?'

ব্রাহ্মণ তখন একটু হেসে ঘরে গিয়ে একটা পুঁথি নিয়ে এলেন। পুঁথি খুলে কয়েকটা মন্ত্র পড়তেই ছেলেটা জ্যান্ত হয়ে আগুন থেকে বেরিয়ে এসে, মাকে আবার জ্বালাতে লাগল। তাই দেখে বামন খুশিমনে ভাত খাওয়া শেষ করলো।

এতদিন পরে তার মনে আশার আলো দেখা দিল। ঐ পুঁথিতে নিশ্চয় সঞ্জীবনী মন্ত্র লেখা আছে। ওটিকে কোনো উপায়ে সরাতে পারলে, ঐ মন্ত্রের সাহায্যে মধুমালতীকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়।

এই কথা ভেবে বামন সে রাতটা ব্রাহ্মণের বাড়িতে থেকে গেল। রাত যখন গভীর হল, বাড়ির সকলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সেরে শুয়ে পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন নিঃশব্দে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে পুঁথিটি হস্তগত করে, সেই রকম নিঃশব্দে সরে পড়ল।

কয়েক দিন পরে সে জয়স্থল গ্রামের শ্মশান ঘাটে এসে পৌঁছল। সেখানে পাতার কুটিরে মধুসূদন তখনো যোগসাধনা করছিল। ঠিক ঐ সময়ে ত্রিবিক্রমও দৈবাৎ এসে উপস্থিত হল।

বামন তখন অন্যদের বলল, 'আমি মৃতসঞ্জীবনের মন্ত্র শিখে এসেছি। তোমরা অস্থি আর ছাই এক জায়গায় জড়ো করে রাখো।'

সব ব্যবস্থা হলে বামন মন্ত্র পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে অস্থি আর ছাইয়ের জায়গায় মধুমালতীর সুন্দর দেহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

পাত্ররা তিনজনেই আনন্দে অধীর হয়ে বলতে লাগল, 'এই কন্যাকে আমি বিয়ে করব, আমার জন্যেই ও বেঁচে উঠেছে!' তাই নিয়ে মহা তর্কাতর্কি বেধে গেল।

এইখানেই গল্প শেষ করে, বেতাল প্রশ্ন করল, 'এবার বল তো মহারাজ, কার সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বিয়ে হওয়া উচিত মধুসূদনের সঙ্গে, যে এতদিন পাতার কুটিরে বসে যোগসাধন করেছে।'

বেতাল বলল, 'তা কেন? ত্রিবিক্রম যদি অস্থিগুলো যত্ন করে রেখে না দিত আর বামন যদি সঞ্জীবনী মন্ত্র না শিখে আসত, তাহলে মধুমালতী কি করে বেঁচে উঠত?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'কিন্তু ত্রিবিক্রম অস্থি সংগ্রহ করে ছেলের কাজ করেছিল। বামন প্রাণ দিয়ে বাপের কাজ করেছিল। তাদের সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হতে পারে না। বাকি থাকে মধুসূদন। সে ছাই সংগ্রহ করে কুঁড়ে ঘর বেঁধে, এতকাল অপেক্ষা করেছে। তার সঙ্গেই তো বিয়ে হওয়া উচিত।'

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার গাছে ঝুলে রইল। আর বিক্রমাদিত্যও পিছন পিছন ছুটে গিয়ে ফের তাকে পেড়ে এনে, কাঁধে ফেলে, যোগীর আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। বেতালও তার পরে গল্প আরম্ভ করল।

৩য় গল্প

সেকালে বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে একজন বড় দয়ালু, বুদ্ধিমান ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর কাছে হঠাৎ একদিন দক্ষিণদেশ থেকে বীরবর নামে এক যোদ্ধা এসে কাজ চাইল। তার চমৎকার বলিষ্ঠ চেহারা ও সুন্দর ব্যবহারে খুশি হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন সে কত বেতন চায়।

বীরবর বলল, 'রোজ এক হাজার সোনার মোহর পেলেই আমার চলে যাবে, মহারাজ।'

অচেনা লোকটি এত বেশি টাকা চায় শুনে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবু মনে মনে ঠিক করলেন, এ লোকটিকে পরীক্ষা করে দেখাই যাক, এ এত টাকার যোগ্য কিনা। বলছে তো বাড়িতে তার স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে ছাড়া কেউ নেই।

সেদিন থেকেই বীরবর রাজবাড়ি রক্ষা করার কাজে বহাল হল। এমন কি প্রথম দিনের হাজার মোহর তাকে তখনি দিয়ে দেওয়া হল। তার থাকবার জন্য যে বাড়ি দেওয়া হয়েছিল, টাকা নিয়ে বীরবর সেখানে গেল।

বাড়ি গিয়ে মোহরের অর্ধেক ভাগ সে ব্রাহ্মণদের দান করল। যা বাকি রইল, তার অর্ধেক বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী—এদের দিল। বাকি টাকা দিয়ে হাজার হাজার গরীব দুঃখী অনাথকে পেট ভরে খাইয়ে, সামান্য যা রইল সপরিবারে তাই খেয়ে দিন কাটাল।

শুধু সে দিন নয়, রোজই এই ভাবে বীরবরের হাজার মোহর খরচ হতে লাগল। কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি যারপরনাই আশ্চর্য হলেন। সারা দিন এইভাবে কাটত। সন্ধ্যা থেকে সারা রাত বীরবর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজবাড়ি পাহারা দিত। তাকে পরখ করবার জন্য রাজা গভীর রাতে নানা রকম শক্ত কাজ দিতেন। সে তখুনি তাঁর আদেশ পালন করত।

একদিন মাঝরাতে মেয়েমানুষের কান্না শুনে রাজা বীরবরকে তার কারণ খুঁজতে পাঠালেন। নিজেও গোপনে তার পিছনে পিছনে গেলেন। বীরবর কান্না লক্ষ্য করে একেবারে শ্মশানে গিয়ে পৌঁছল। দেখল সেখানে একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে দামী দামী গয়নাগাঁটি পরে বুক চাপড়ে কাঁদছেন। বীরবর ব্যস্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, আপনি কে? কেনই বা এত শোক করছেন?'

মেয়েটি বললেন, 'আমি এখানকার রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের বাড়িতে নানা রকম অন্যায় কাজ হচ্ছে, তাই আমি আর সেখানে থাকতে পারছি না। কিন্তু আমি গেলেই অ-লক্ষ্মী এসে আমার জায়গা দখল করবে। তখন অমন যে ধার্মিক রাজা, তাঁর ভারি অমঙ্গল হবে, এমন কি

প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। তাই আমি কাঁদছি।'

এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনে বীরবর শিউরে উঠল। দেবীর কাছে জোড়-হাতে সে বলল, 'মা, কোনো উপায়ে যদি রাজার এ বিপদ দূর করা যায় আমাকে বলুন। যে ভাবে পারি আমি আপনার আদেশ পালন করব।'

রাজলক্ষ্মী বললেন, 'পারবে পালন করতে? এখান থেকে পূব দিকে আধ যোজন দূরে একটি মন্দির আছে। সেখানে এক দেবী আছেন, তাঁর কাছে যদি কেউ নিজের হাতে নিজের ছেলেকে বলি দিতে পারে, তাহলে তাঁর দয়ায় রাজার সব অমঙ্গল কেটে যাবে।'

এ কথা শুনেই বীরবর বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে তুলে, তাকে সব কথা বলল। সেও সঙ্গে সঙ্গে ছেলের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে দেবীর কথা জানাল। ছেলে বলল, 'এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা। তোমার আদেশ মতো কাজ করছি, বাবার কর্তব্য পালনে সাহায্য করছি আর নিজের শরীরটা দেবতার কাজে নিবেদন করছি। এ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।'

তারপর বীরবর সপরিবারে সেই মন্দিরে চলল। রাজা সব কথাই শুনেছিলেন, তিনিও গোপনে তাদের সঙ্গে চললেন। পূজোর সামগ্রী সবই বীরবর সঙ্গে করে এনেছিল। সেখানে পৌঁছে ভক্তিভরে পূজো শেষ করে, দেবীর সামনে ছেলেকে বলি দিল।

বীরবরের মেয়ে ভাইকে বড়ই ভালোবাসত। এই নিদারুণ দৃশ্য সইতে না পেরে, খড়্গটি তুলে নিয়ে সে নিজের বুকে বসিয়ে দিল। বীরবরের স্ত্রী তখন শোকে পাগলের মতো ঐ খড়্গ দিয়েই আত্মহত্যা করল। বীরবর এ সবই দেখল। এখন খড়্গটি তুলে নিয়ে বলল, 'আর কেন? কিসের জন্য আর গোলামি করা, কোন সুখেই বা বেঁচে থাকা? এই বলে সেও খড়্গাঘাতে মরল।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজা এতক্ষণ এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না। বীরবরকে যে বাধা দেবেন সে শক্তিও ছিল না। এবার তিনি খড়্গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে গেলেন, এমন সময় দেবী দুর্গা দেখা দিয়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন।

'বাছা, তোমার সাহস আর ন্যায় বিচার দেখে আমি খুশি হয়েছি। কি বর চাও বল।'

রাজা বললেন, 'মা, যদি খুশি হয়ে থাক, তাহলে এদের চারজনকে বাঁচিয়ে দাও। এর বেশি আমার কিছু চাইবার নেই।'

দেবী বললেন, 'তাই হোক।' তখুনি পাতাল থেকে অমৃত এল। বীরবরদের গায়ে সেই অমৃত ছিটিয়ে দেবামাত্র তারা সুস্থ হয়ে উঠে বসল, যেন ঘুম থেকে জেগেছে। রাজার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। তিনি দেবীর পায়ে পড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। দেবী তাঁকে আশীর্বাদ করে, আরো বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সভায় এসে রাজা রূপসেন গতরাত্রের আশ্চর্য কথা সকলের সামনে বলে, সভাসদ্‌দের সাক্ষী করে, প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'বল মহারাজ, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি মহৎ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমার মতে রাজাই সবচেয়ে মহৎ।' বেতাল বলল, 'তা কেন?'

বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, 'বীরবর প্রভুর প্রতি তার কর্তব্য পালন করেছিল। তার স্ত্রী আর ছেলে তো মরবেই। কারণ স্বামীর জন্য কি বাপের জন্য প্রাণ দেওয়া সেবকের ধর্ম। কিন্তু রাজার তো সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবু তিনি সেবকের জন্য প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন।'

এবারও ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গিয়ে আবার শ্মশানের সেই গাছের ডালে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্যও তাকে নামিয়ে, কাঁধে তুলে, ফের রওনা দিলেন। বেতালও চতুর্থ গল্প শুরু করল।

৪র্থ গল্প

সেকালে ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন বলে একজন কমবয়সী রাজা ছিলেন। সকলে তাঁর প্রশংসা করত। চূড়ামণি নামে তাঁর এক আশ্চর্য শুকপাখি ছিল। তার জ্ঞানের সীমা ছিল না। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সব সে

বইয়ের পাতার মতো পড়তে পারত।

রাজা তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো পাখি, আমার কার সঙ্গে বিয়ে হবে?' চূড়ামণি বলল, 'মগধ দেশের রাজা বীরসেনের মেয়ে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে।' এরপর রাজার দৈবজ্ঞও যখন সেই কথাই বলল, রাজার বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। তিনি একজন অতি বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের হাতে মগধের রাজার কাছে বিয়ের সম্বন্ধ পাঠালেন।

এদিকে মগধের রাজকুমারীও রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁরও মদন-মঞ্জরী বলে এক শারি ছিল। মদনমঞ্জরীও ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারত।

রাজকুমারী তাকে বললেন, 'বল তো পাখি, কার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?' শারি বলল, 'ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সঙ্গে।' এ-কথা শুনে অবধি মনে মনে চন্দ্রাবতী বড়ই খুশি।

এর কিছুদিন পরেই অনঙ্গসেনের দূতও বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসে পৌঁছল। রাজা আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। দূত যখন আহ্লাদিত হয়ে ফিরে গেল, চন্দ্রাবতীর বাবা তার সঙ্গে নানা রকম সুন্দর উপহার নিয়ে বিয়ে পাকা করতে একজন ব্রাহ্মণকে পাঠালেন।

এরপরে ভালো দিন দেখে অনঙ্গসেন বরযাত্রীদের নিয়ে মগধে গিয়ে, মহা ধুমধামের সঙ্গে চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে ভোগবতী নগরে ফিরে এলেন। সেখানেও আনন্দ উৎসব লেগে গেল।

বিয়ের পর পরম সুখে রাজা-রানীর দিন কাটতে লাগল। এক দিন রাজা রানীকে বললেন, 'আমরা যখন বিয়ে করে এত সুখী হয়েছি, আমাদের আদরের পাখিরাই বা হবে না কেন? এসো, দুজনার বিয়ে দিই।' তাই হল। দুই পাখির বিয়ে দিয়ে তাদের একটা চমৎকার বড় খাঁচায় রাখা হল।

একদিন দুই পাখিতে তর্ক বাধল। শারি বলতে লাগল, 'পুরুষরা বড় খারাপ হয়, জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, খুনে। ওদের আমি দেখতে পারি না।' শুক বলল, 'মেয়েদের কথা আর বল না। তারাও ঠকায়, মিছে কথা বলে, লোভী, অধার্মিক, খুনী।'

তর্ক শুনে রাজা বললেন, 'ও কি ! তোমরা মিছিমিছি এভাবে তর্ক করছ কেন ?' শারি বলল, 'মিছিমিছি নয় মহারাজ। আমি পুরুষদের বিষয়ে একটা সত্যি গল্প বলছি, শুনেই বুঝতে পারবেন তারা কত নিষ্ঠুর আর অধার্মিক।' এই বলে সে গল্প আরম্ভ করল।

ইলাপুরে মহাধন নামে একজন বণিক ছিল। সারাজীবন তাঁর বড় দুঃখ যে তাঁর একটিও ছেলে হল না। শেষটা বেশি বয়সে যখন একটি ছেলে হল তখন তাঁর আনন্দ দেখে কে ! ছেলের নাম রাখলেন নয়নানন্দ। বড় যত্নে তাকে তিনি মানুষ করতে লাগলেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে ভালো গুরুর হাতে দিলেন।

কিন্তু স্বভাব বড় সাংঘাতিক জিনিস। ছোটবেলা থেকে নয়নানন্দ শুধু খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশত, লেখাপড়ায় মন দিত না, হাজার রকম বদভ্যাস শিখল, মুখে খারাপ কথা লেগে থাকত। বাপ মায়ের দুঃখ দেখে কে !

কিছুকাল পরে বাপ গেলেন মারা। তাঁর সমস্ত ধন সম্পত্তি নয়নের হাতে এসে পড়াতে, সে দু'হাতে নানান্ বদ খেয়ালে টাকা ওড়াতে লাগল। এদিকে এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই। শেষে এমন দিন এল যখন তার পরনের একটি আস্ত জামা, বা মুখে দেবার এক গ্রাস ভাত রইল না। তখন সে ইলাপুর ছেড়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে যখন চন্দ্রপুর বলে এক জায়গায় পৌঁছল, তার মনে পড়ল এখানে তার বাবার বন্ধু হেমগুপ্ত নামে একজন বণিক থাকেন। তিনি খুব বড় লোক। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন গিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠল। উঠেই নিজের পরিচয় দিল।

তার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-চোপড় আর রোগা অযত্নের চেহারা দেখে হেমগুপ্ত অবাক্ হয়ে গেলেন। নয়ন ভালোমানুষ সেজে বলল, 'কয়েকটা জাহাজ বোঝাই ভালো ভালো জিনিস নিয়ে ব্যবসা করতে বেরিয়েছিলাম। ভীষণ ঝড়ে পড়ে আমার জাহাজগুলো ভেঙেচুরে গেল, মাঝিমাল্লা জিনিসপত্র কোথায় ছিটকে পড়ল কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রাণ হাতে করে কোনোমতে জাহাজের একটা ভাঙা তক্তা আঁকড়ে ঢেউ-

য়ের সঙ্গে এক সময় তীরে এসে আছড়ে পড়লাম। সেই থেকে পথই আমার ঘর।' এই বলে নয়ন খানিকটা নকল কান্নাও কেঁদে দিল।

হেমগুপ্তর আর তাঁর স্ত্রীর বড় মায়া হল। তাকে ঘরে তুলে আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তুলে, ভালো জামা-কাপড় পরিয়ে দেখলেন ছেলের দেহে রূপ আর ধরে না। তার উপর প্রিয় বন্ধুর ছেলে। হেমগুপ্তর ইচ্ছায় তাঁর পরমাসুন্দরী লক্ষ্মী মেয়ে রত্নাবতীর সঙ্গে নয়নানন্দের বিয়ে হল।

বিয়ের পর সে শ্বশুরবাড়িতেই রইল। কিন্তু সেখানে তার মন টিকবে কেন? সঙ্গীসাথী, বদ আমোদপ্রমোদ তো আর নেই। কাজেই কিছুদিন পরে সে স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাইল। এতে শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই খুশি হলেন। এই রকমই তো হওয়া উচিত।

অবশেষে একদিন দামী দামী গয়না, কাপড় পরিয়ে, পালকি করে মেয়ে-জামাইকে তাঁরা রওনা করে দিলেন। পথে এক ঘন বন। বনে ঢুকেই নয়ন বলল, 'এভাবে বড়লোকের মতো গেলে ডাকাতের হাতে পড়ব। তার চেয়ে তোমার গয়না খুলে পুঁটলি বেঁধে আমার কাছে দাও। পালকি বিদায় করে দিয়ে, দুজনে গরীবদের মতো পায়ে হেঁটে চলি। তাহলে কোনো ভয় থাকবে না।'

যেমন বলা তেমনি কাজ। পালকি ফিরে গেল। আরো ঘন বনে পথের পাশে একটা কুয়ো। নয়ন তার স্ত্রীকে সেই কুয়োতে ঠেলে ফেলে দিয়ে, পুঁটলি নিয়ে চম্পট দিল। রত্নাবতী চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

কথায় বলে, 'রাখে হরি মারে কে।' দৈবাৎ এক পথিক ঐ পথে যাচ্ছিল। কান্না শুনে কাছে গিয়ে দেখে কুয়োর মধ্যে এক সুন্দরী মেয়ে। অনেক কষ্টে তাকে তুলে, পথিক জানতে চাইল কি হয়েছিল।

রত্নাবতী কিছুতেই স্বামীর নিন্দা করতে পারল না। বলল, 'ডাকাতরা আমার গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে, আমাকে কুয়োয় ফেলে, আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে।'

লোকটি বড় দয়ালু ছিল। রত্নাবতীকে সে যত্ন করে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিল। মেয়ের দুর্দশা দেখে আর জামাইকে ডাকাতে ধরে নিয়ে

গেছে শুনে মা-বাপের চোখে জল এল। তাঁরা রত্নাবতীকে আশ্বাস দিয়ে, আদর যত্ন করে, নতুন গয়না গড়িয়ে দিয়ে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে নয়ন দেশে ফিরে, গয়না বেচে, আবার বদ সঙ্গীদের সঙ্গে ফুর্তি করে অল্প দিনেই দেউলে হয়ে গেল। তখন সে নির্লজ্জের মতো ভাবতে লাগল, 'যাই একবার শ্বশুরবাড়ি, কাঁদুনি গেয়ে কিছু টাকাকড়ি হাতিয়ে আবার সরে পড়ব। রত্না তো আর নেই যে সত্যি কথা বলে দেবে।'

কিন্তু সেখানে পৌঁছে প্রথমেই রত্নাবতীর সঙ্গে দেখা। নয়ন চমকে উঠেছিল। রত্না বলল, 'আমি মা-বাবাকে বলেছি ডাকাতরা আমাকে কুয়োয় ফেলে, তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমিও তাই বল। নইলে তাঁরা দুঃখ পাবেন।'

তাই বলল নয়ন। শ্বশুর-শাশুড়ি হেসে-কেঁদে তাকে কত আদর যত্ন করলেন। কিন্তু সেই হাতেই ছোরা মেরে ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করে, তার সব গয়না নিয়ে, নয়নানন্দ পালিয়ে গেল।

গল্প শেষ করে শারি বলল, 'এ-সব আমার নিজের চোখে দেখা, মহারাজ। সাধে আমি পুরুষদের ঘৃণা করি!'

তখন অনঙ্গসেন শুককে বললেন, 'এবার তুমি বল মেয়েদের তুমি কেন পছন্দ কর না।'

শুক তার গল্প আরম্ভ করল।

কাঞ্চনপুরে সাগর দত্ত বলে এক বণিক ছিলেন। তাঁর ছেলে শ্রীদত্ত দেখতেও সুন্দর, স্বভাবও তেমনি ভালো। অনঙ্গপুরের সোম দত্ত বণিকের মেয়ে জয়শ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর শ্রীদত্ত বাণিজ্যে গেল, জয়শ্রী তার বাপের বাড়িতে রইল।

অনেক দিন কেটে গেল শ্রীদত্ত তবু ফিরল না। তার জন্য অপেক্ষা করে করে জয়শ্রী বিরক্ত হয়ে উঠল। অন্যান্য মেয়েদের মতো তার কি কখনো ঘর সংসার হবে না? এই সময় একজন রূপবান যুবককে পথ দিয়ে যেতে দেখে, জয়শ্রীর মনে হল, আহা, এর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি কত সুখী হতাম।

যতই দিন যেতে লাগল জয়শ্রীর মন ততই নিজের স্বামীর উপর বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল। অনেকদিন পর, সত্যি সত্যি শ্রীদত্ত বাণিজ্য শেষ করে জয়শ্রীর জন্য নানান্ দেশ থেকে আনা সুন্দর সুন্দর শাড়ি গয়না সুগন্ধী জিনিস উপহার নিয়ে, শ্বশুরবাড়িতে এল।

তাকে দেখে সোম দত্ত আর তাঁর স্ত্রী যত আহ্লাদিত হলেন, জয়শ্রী ততই চটে গেল। পথে দেখা সেই যুবককে তার ঢের বেশি পছন্দ ছিল। জামাইকে আদর করে খাওয়ানো দাওয়ানো হল, জয়শ্রী তার ধার-কাছেও এল না। তারপর ওর মা ওকে একরকম জোর করে শ্রীদত্তের কাছে দিয়ে এলেন। শ্রীদত্ত খুশি হয়ে তাকে সুন্দর সুন্দর উপহার দিতে গেল। জয়শ্রী মুখ বেঁকিয়ে সে-সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। শ্রীদত্ত বড়ই দুঃখিত হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়েও পড়ল।

অমনি জয়শ্রী উঠে পড়ে, ঐ সব সুন্দর কাপড় গয়না মাটি থেকে তুলে গায়ে দিল। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে পথে বেরিয়ে পড়ল। পথের ধারে এক চোর লুকিয়ে বসে ছিল। জয়শ্রীর গায়ে দামী গয়না দেখে, সে তার পিছু নিল।

কাছেই জয়শ্রীর সখীর বাড়ি। জয়শ্রী সেখানে গেল। সেদিন সেখানে সেই রূপবান যুবকটিও অতিথি হয়েছিল। সে অন্য ঘরে বিশ্রাম করছিল। এমন সময় একটা বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেল।

সখীর বাড়ির সদর দরজার বাইরে একটা শিরীষ গাছ। সেই গাছে একটা ভূত থাকত। চোরও ঐ গাছতলায় লুকিয়ে বসে ছিল। দুজনেই সব দেখেছিল। অমন ভালো স্বামীর সঙ্গে জয়শ্রীর এত খারাপ ব্যবহার দেখে ভূতটা বেজায় রেগে ছিল। তারপর যেই না জয়শ্রী ঐ ঘরে ঢুকেছে অমনি ভূত করেছে কি, অতিথির মরা দেহে ঢুকে লাফিয়ে উঠে জয়শ্রীর নাকের ডগাটা এক কামড়ে কেটে নিয়েছে, নিয়েই ভালো মানুষের মতো আবার গাছে গিয়ে চড়েছে। ব্যাপার দেখে চোর তাজ্জব বনে গেল!

এদিকে জয়শ্রীর গা রক্তে ভেসে যেতে লাগল। সখী কি যে করবে ভেবে পেল না। একে অতিথি মরে পড়ে আছে, তার উপর এই কাণ্ড!

ছুটতে ছুটতে জয়শ্রী বাপের বাড়িতে ঢুকে হাউমাউ করে কেঁদে বলতে লাগল, 'ও মা, ও বাবা, এ কেমন স্বামীর হাতে দিয়েছ আমাকে ! সে যে আমার নাক কেটে নিয়েছে !'

বাড়িসুদ্ধ সবার ঘুম গেল ছুটে। ও মা, তাইতো ! কি সর্বনাশ ! মেয়ের যে নাক-কাটা, সারা গায়ে রক্ত !

হট্টগোল শুনে জামাই বেচারির ঘুম ভেঙে গেল। সে ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরোতেই শ্বশুর তাকে কোটালের হাতে সঁপে দিলেন। তার আর দুর্দশার শেষ রইল না। নানা রকম অত্যাচার অপমান সইতে হল, তারপর তাকে টেনে প্রধান বিচারপতির সামনে খাড়া করা হল। তিনি জয়শ্রীর কথাই বিশ্বাস করলেন। তাছাড়া শ্রীদত্ত শুধু বলেছিল, 'ধর্মাবতার, আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। আপনি যেমন বিচার করবেন, আমি তাই মেনে নেব।'

বিচারপতি তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে, শূলে চড়াবার হুকুম দিলেন। চোরটা কিন্তু খুব খারাপ ছিল না। সে তো সব-ই জানত। একটা নির্দোষ লোকের প্রাণদণ্ড হবে, এ তার সহ্য হল না। সে এগিয়ে এসে বলল, 'ধর্মাবতার, এভাবে একজন দুষ্ট মেয়ের কথা বিশ্বাস করে, কোনো খোঁজখবর না নিয়েই, একজন নির্দোষ লোকের প্রাণদণ্ড দিচ্ছেন কেন ?'

তখন বিচারপতির চৈতন্য হল। তিনি চোরের কাছে সব কথা শুনে, জয়শ্রীর সখীর বাড়িতে লোক পাঠালেন। তারা যখন সত্যি সত্যি সেখানে ঐ মরা মানুষটাকে দেখতে পেল আর জয়শ্রীর কাটা নাকের ডগাটিও নিয়ে এল, তখন আর বিচারপতির আসল অপরাধী সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রইল না। শ্রীদত্তকে শুধু মুক্তি দিলেন না, তাকে হেনস্থা করার জন্য অনেক ক্ষতিপূরণও দিলেন।

আর জয়শ্রীর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে শহর-ময় ঘুরিয়ে আনা হল।

গল্প শেষ করে শুক বলল, 'তবেই বুঝুন, মহারাজ আমি কেন মেয়ে-দের পছন্দ করি না।'

এই বলে বেতালও তার গল্প শেষ করে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা

করল, 'এবার আপনি বলুন মহারাজ, জয়শ্রী আর নয়নানন্দের মধ্যে কে বেশি পাপিষ্ঠ ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দুই-ই সমান।'

আবার ঠিক উত্তর পেয়ে, বেতাল শাঁ করে শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্যও সঙ্গে সঙ্গে তাকে নামিয়ে কাঁধে ফেলে আবার রওনা দিলেন। বেতালও অমনি তার পঞ্চম গল্প শুরু করল।

৫ম গল্প

সেকালে ধারা নগরে মহাবল নামে এক ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। হরিদাস নামে তাঁর এক জ্ঞানীগুণী দূত ছিল। ঐ দূতের মেয়ের নাম মহাদেবী। মহাদেবী দেখতে বড় সুন্দর। তার উপরে যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি লক্ষ্মী। মেয়ের বিয়ের বয়স হলে তার জন্য যখন পাত্র খোঁজা হচ্ছে, সে তখন বাপকে গিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে এমন মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিও, যাঁর মধ্যে সব গুণ আছে।'

হরিদাস বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

এর কিছুদিন পরে মহাবল হরিদাসকে দক্ষিণদেশে পাঠালেন, তাঁর পরম বন্ধু হরিশ্চন্দ্রের খবর এনে দেবার জন্য। সেখানে হরিদাস হরিশ্চ-ন্দ্রের কাছে যথেষ্ট আদর পেলেন। রাজা সুস্থ দেহে মনের সুখে আছেন দেখে, হরিদাস দেশে ফিরবার যোগাড় করছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে, মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়ল।

হরিদাস বললেন, 'তাকে আমি কথা দিয়েছি যে সব রকম গুণের অধিকারী, এমন বরের সঙ্গে বিয়ে দেব। তোমার কি সেরকম গুণ আছে ?'

সে বলল, 'আমি ছোট বেলা থেকে নানান বিদ্যায় দক্ষ হয়েছি। আমি এমন একটি আকাশযান তৈরি করেছি যা আপনাকে এক বছরের পথ এক ঘণ্টায় পার করে দেবে।'

হরিদাস বললেন, 'বেশ, তাহলে ঐ আকাশযানে আমাকে নিয়ে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল।'

ব্রাহ্মণের ছেলের যেমন কথা তেমন কাজ। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা ধারা নগরে পৌছলেন। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখেন, কি মুশকিল, সুরদাসের স্ত্রী আর ছেলে, আরো দুটি মহাগুণী পাত্র এনে উপস্থিত করে-ছেন। পাত্ররা কেউ কারো চেয়ে কম যায় না।

সারারাত হরিদাস আকাশ-পাতাল ভেবেও কি যে করবেন তার কূল পেলেন না। সকালে উঠে দেখেন মহাদেবী তার ঘরে নেই। ঘরেও নেই, অন্য কোথায়ও নেই। তার মা-বাপের মাথায় বাজ পড়ল। এবার কি হবে ?

সকালে তিন পাত্রের একজন বলল, 'আমি সমাধিতে বসলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব দেখতে পাই।' এই বলে সমাধিতে বসল। পরে হরিদাসকে বলল, 'আমি দেখতে পেলাম একটা রাক্ষস মহাদেবীকে তুলে নিয়ে গিয়ে, বিন্ধ্য পাহাড়ে রেখেছে।'

দ্বিতীয় পাত্র বলল, 'আমি শব্দভেদী বাণ দিয়ে যে-কোনো শত্রু মারতে পারি। খালি একবার বিন্ধ্য পাহাড়ে যেতে পারলেই হল।'

তখন তৃতীয় পাত্র বলল, 'আমার এই আকাশযান রথে চড়ে এক নিমেষে সেখানে তুমি যেতে পারবে।'

হলও তাই। ঐ রথে করে বিন্ধ্য পাহাড়ে গিয়ে, শব্দভেদী বাণ দিয়ে রাক্ষস মেরে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মহাদেবীকে নিয়ে ফিরে এল। তখন সকলের কি আনন্দ !

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'তাহলে বল মহারাজ, ঐ তিন বরের মধ্যে কে সবচেয়ে উপযুক্ত ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যে রাক্ষস মেরে, মহাদেবীকে নিয়ে এল, সে।'

বেতাল বলল, 'কেন ? অন্যরাও তো সমান গুণী।'

রাজা বললেন, 'যে মহাদেবীকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনল, তার চেয়ে উপযুক্ত কেউ নয়।'

আবার ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানের গাছে গিয়ে ঝুলে রইল এবং আবার বিক্রমাদিত্য তাকে পেড়ে এনে, কাঁধে ফেলে রওনা দিলেন। তখন বেতাল বলল, 'ষষ্ঠ গল্প বলি, শোন মহারাজ।'

৬ষ্ঠ গল্প

সেকালে ধর্মপুর বলে এক নগর ছিল, রাজা তার ধর্মশীল। যেমন নাম-করা নগর, তেমনি ভালো রাজা। কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই, একটিও ছেলে হল না।

রাজার এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম অন্ধক। একদিন অন্ধক বললেন, 'মহারাজ, চমৎকার এক মন্দির তৈরি করে, সেখানে দেবী কাত্যায়নীর পূজো করুন। কাত্যায়নী হলেন দুর্গা।' মন্দির তৈরি হলে, তার মধ্যে কাত্যায়নীর সোনার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, রাজা রোজ ভক্তি-ভরে পূজো দিতে লাগলেন।

শেষে প্রসন্ন হয়ে দেবী দেখা দিয়ে বললেন, 'বর চাও।' রাজা ছেলের মুখ দেখতে চাইলেন। দেবীর দয়ায় হলও তাই। আহ্লাদে আটখানা হয়ে রাজা ঘটা করে পূজো দিলেন আর গরীব দুঃখীকে পেট ভরে খাইয়ে, হাত ভরে টাকাকড়ি দিলেন। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এই সময় দীনদাস নামে এক তাঁতী রাজধানীতে এসে একটি সুন্দর তাঁতীর মেয়েকে দেখে, তাকে বিয়ে করার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠল। তার এক বন্ধু বলল, 'এই মন্দিরের দেবী কাত্যায়নীকে ভক্তিভরে পূজো করলে, তিনি সব মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। দেখছ না, রাজা কেমন বুড়ো বয়সে ছেলের মুখ দেখলেন।'

একথা শুনে দীনদাস মন্দিরে গিয়ে ভক্তিভরে পূজো দিয়ে বলল, 'মা, তুমি যদি আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ কর, তাহলে নিজের মাথা কেটে তোমার পায়ে দেব।' বন্ধু এসব কিছুই জানতে পারল না।

এই ব্যাপারের কিছু দিন পরে, ছেলের মনের ইচ্ছা জানতে পেরে, দীনদাসের বাবা ঐ কন্যার বাপের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে দীন-দাসের বিয়ের ঠিক করে ফেললেন। অল্প দিনের মধ্যে বিয়ে হয়েও গেল।

বিয়ের পর বড় সুখে দীনদাসের দিন কাটতে লাগল। দেবীর কাছে শপথের কথা তার মন থেকে একেবারে মুছে গেল। বেশ কিছু কাল কেটে যাবার পর, দীনদাস স্ত্রী আর বন্ধুর সঙ্গে রাজধানীতে এল। দুদিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে যাবে।

দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরের সামনে এসে হঠাৎ তার সেই পুরনো শপথের কথা মনে পড়ে গেল। দেবীকে না নিজের মাথা কেটে দিতে হবে! সেকথা কি করে এতদিন মনে হয়নি?

দীনদাস স্ত্রীকে আর বন্ধুকে একটু দাঁড়াতে বলে, মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেবীর পূজো করে, বলির খড়্গ তুলে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

এদিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, বন্ধু মন্দিরে এল কি ব্যাপার দেখতে। দীনদাসের মৃতদেহ দেখে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। 'এ কি সর্বনাশ! লোকে নিশ্চয় বলবে আমিই বন্ধুকে মেরে ফেলেছি, তার সুন্দরী স্ত্রীকে বিয়ে করার আশায়! তাহলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?'

একথা মনে আসবামাত্র বন্ধুও ঐ খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল। আরো খানিকক্ষণ পর, ভয়ে ভাবনায় কাতর হয়ে, দীনদাসের স্ত্রীও মন্দিরে ঢুকে ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে, কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর মনে মনে বলল, 'নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম, তাই আজ এই সর্বনাশ ঘটল! আমিও এ জীবন রাখব না।' এই বলে যেই না সে খড়্গ তুলেছে, অমনি দেবী তার সামনে দেখা দিয়ে, হাত ধরে ফেলে বললেন, 'বাছা, বর চাও।'

সে বলল, 'মা, সত্যি যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এঁদের দুজনকে বাঁচিয়ে দাও।'

দেবী বললেন, 'তুমি ওদের শরীর আর মাথা দুটো এক সঙ্গে করে রাখ, আমি প্রাণ দিচ্ছি।'

তখন আহ্লাদে গদ্গদ হয়ে দীনদাসের স্ত্রী এক কাণ্ড করে বসল। মাথা দুটি ভুল শরীরে জুড়ে দিল। দেবী প্রাণদান করলে দীনদাসের মাথা নিয়ে বন্ধুর শরীর আর বন্ধুর মাথা নিয়ে দীনদাসের শরীর উঠে বসল।

এইখানেই গল্প শেষ করে বেতাল প্রশ্ন করল, 'বল মহারাজ, ঐ দুজনের মধ্যে কে আসলে ঐ মেয়ের স্বামী?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শোন বেতাল, শরীরের সব অঙ্গের মধ্যে মাথাই হল সেরা। যে শরীরে দীন-

দাসের মাথা লেগেছে, সেই ঐ মেয়ের স্বামী।'

এ কথা শোনা মাত্র, বেতাল শ্মশানে গিয়ে গাছে ঝুলল আর রাজা তাকে পেড়ে এনে, আবার রওনা দিলেন।

বেতাল বলল, 'সপ্তম গল্প শোন তাহলে।'

৭ম গল্প

সেকালে চম্পানগরে চন্দ্রাপীড় রাজার মেয়ে ত্রিভুবনসুন্দরী দেখতে বড় সুন্দর ছিল। তার বিয়ের বয়স হলে, চারদিক থেকে রাজারাজড়ারা বিয়ের সম্বন্ধ পাঠাতে লাগলেন। সম্বন্ধের সঙ্গে নিজেদের গুণের বিবরণ আর দক্ষ শিল্পীদের আঁকা ছবিও পাঠাতে লাগলেন।

এদিকে মেয়ের কোনো পাত্রকেই পছন্দ হয় না। শেষটা চন্দ্রাপীড় বললেন, 'তাহলে, স্বয়ংবর সভা ডাকা হোক।' তাতেও মেয়ে রাজী নয়। 'ওসব হল গিয়ে লোক দেখানি আড়ম্বর। যে পাত্র বিদ্যা বুদ্ধি আর শক্তি—এই তিন গুণে শ্রেষ্ঠ, আমি তাঁকেই বিয়ে করব।'

আবার খোঁজাখুঁজি লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আগত চারজন পাত্র এসে ঠেকল। সবাই রূপে গুণে সমান। রাজা বললেন, 'যে যার নিজের গুণের কথা বল।'

প্রথম পাত্র বলল, 'আমি ছোটবেলা থেকে অনেক পরিশ্রম করে সব রকম বিদ্যা রপ্ত করেছি। তার উপর রোজ আমি একটি অপূর্ব কাপড় বুনে, পাঁচটি রত্নের বদলে বিক্রি করি। একটি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিই, একটি দিই দেবতাকে, একটি আমি গয়না করে গায়ে পরি, একটি রেখে দিই, আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে তার জন্যে আর শেষেরটি দিয়ে খুব ভালো-ভাবেই আমার খরচপত্র চলে যায়। এই হল আমার গুণ আর চেহারা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

দ্বিতীয় পাত্র বলল, 'আমি সব রকম পশুপাখির ভাষা জানি। আমার মতো গায়ের জোর কারো নেই। আমার রূপ তো দেখছেনই।'

তৃতীয় পাত্র বলল, 'আমার মতো শাস্ত্রজ্ঞ আর নেই। আমার রূপের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।'

চতুর্থ পাত্র বলল, 'মহারাজ, চোখে না দেখে, শুধু শব্দ শুনে আমি যে কোনো লক্ষ্যে তীর বেঁধাতে পারি। আমার মতো সুপুরুষও খুব বেশি নেই।'

চার পাত্রের রূপ দেখে আর গুণের কথা শুনে চন্দ্রাপীড় হকচকিয়ে গেলেন। শেষটা মেয়েকে বললেন, 'মা, তুমি নিজেই একজনকে বেছে নাও।' রূপে গুণে সবাই সমান। ত্রিভুবনসুন্দরী কিন্তু লজ্জায় মুখ নিচু করে রইলেন।

এইখানে গল্প শেষ করে, বেতাল বলল, 'এদের মধ্যে কে রাজকুমারীর স্বামী হবার উপযুক্ত, বল মহারাজ?'

রাজা বললেন, 'যে কাপড় বুনে বিক্রি করে, সে তাঁতী। যে পশু-পাখির ভাষা জানে, সে বৈশ্য। যে সব শাস্ত্রে পণ্ডিত, সে ব্রাহ্মণ। এরা কেউ ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে করতে পারে না। বাকি থাকে যে পাত্র শব্দ-ভেদী বাণ ছুঁড়তে পারে। সেই রাজকুমারীর উপযুক্ত।'

এই উত্তর শুনে বেতাল আবার গিয়ে গাছে ঝুলল, বিক্রমাদিত্য তাকে পেড়ে, কাঁধে ফেলে আবার এগোলেন।

বেতালও অমনি তার অষ্টম গল্প ধরল।

৮ম গল্প

সেকালে মিথিলার রাজা গুণাধিপের সভায় চাকরির আশায় চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত উপস্থিত হল। দুঃখের বিষয়, রাজা তখন অন্তঃপুরে আমোদ-আহ্লাদে দিনের পর দিন কাটাচ্ছিলেন। চাকরি পাওয়া দূরে থাকুক, চিরঞ্জীব তাঁর দেখা পর্যন্ত পেল না।

এদিকে তার টাকাকড়ি প্রায় ফুরিয়ে এল ; চাকরি না পেলে, তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে। চিরঞ্জীব মহা সমস্যায় পড়ে গেল। তার মতো শক্ত-সমর্থ পুরুষ কখনো ভিক্ষা করতে পারে না। অথচ এই অচেনা জায়গায় কে তাকে চাকরি দেবে ? তাছাড়া রাজার অনুগ্রহের অপেক্ষায় নিজেকে সে ছোটই বা করবে কেন ? তার চেয়ে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করা ঢের ভালো। এই ভেবে চিরঞ্জীব সত্যি সত্যি বনে চলে

গেল।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে গুণাধিপের আমোদ-প্রমোদের শখ মিটে গেল। তিনি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে, আবার রাজকার্য হাতে নিলেন। চিরঞ্জীবের কথা জানতেও পারলেন না।
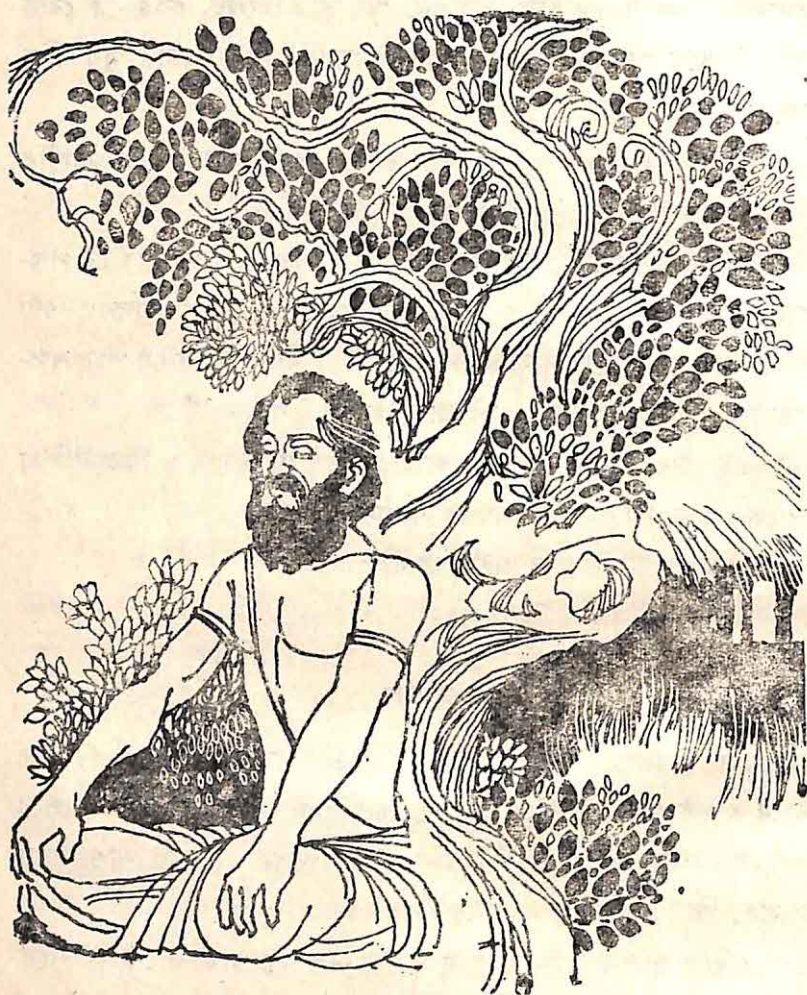
এরপর একদিন দলবল নিয়ে রাজা ঐ বনে শিকার করতে গেলেন। একটা হরিণের পিছনে ছুটে ছুটে, কখন যে দলবলকে পিছনে ফেলে একেবারে একা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছেন, সে বিষয়ে নিজেরই খেয়াল নেই।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রাজা খিদে তেষ্টায় কাতর। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। অথচ কোথাও কোনো জলাশয়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। এমন সময় ঐ ঘন বনের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরের উপর চোখ পড়ল। আশায় তাঁর মন ভরে গেল। তাহলে তো তিনি নিতান্ত একা পড়েননি! এখানে মানুষ থাকে।

রাজা দেখলেন কুটিরের সামনে একজন লোক ধ্যানে বসেছে। দু হাত জোড় করে রাজা তার কাছে জল চাইলেন। সে লোকটি চিরঞ্জীব। সে তখনি উঠে রাজাকে বসবার জায়গা, ঠাণ্ডা জল আর মিষ্টি ফল এনে দিল। রাজা যেন নতুন করে প্রাণ পেলেন।

প্রাণদাতার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনার কাজ দেখে আপনাকে শুদ্ধাচারী তপস্বী মনে হলেও, আপনার চেহারা দেখে অন্যরকম মনে হয়। দয়া করে বলুন আপনি কে, কেন এই ঘোর বনে একলা আছেন?'

চিরঞ্জীব তখন সব কথা খুলে বলল। শুনে রাজার বড় লজ্জা হল। মুখে কিছু বললেন না। সে রাতটা তিনি চিরঞ্জীবের কুটিরেই কাটালেন। পরদিন সকালে নিজের পরিচয় দিয়ে, আগের অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, চিরঞ্জীবকে আদর করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

এবার সবাই অন্য রকম হল। দেখতে দেখতে চিরঞ্জীব রাজার সবচেয়ে বিশ্বাসী অনুচর হয়ে দাঁড়াল। রাজা তাঁকে বড়ই ভালবাসতেন।

একবার বিশেষ দরকারে তিনি তাকে বিদেশে পাঠালেন। সেখান থেকে ফিরবার সময় সমুদ্রের ধারে এক অপূর্ব মন্দির তার চোখে পড়ল। অমনি সে মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করল। বেরিয়েই সামনে একজন অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে দেখে চিরঞ্জীব মুগ্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটি বলল, 'তুমি যা বলবে আমি তাই করব।' চিরঞ্জীব পুকুরে নামল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এক ডুব দিয়ে মাথা তুলেই দেখে কোথায় সমুদ্রতীর, কোথায় মন্দির, কোথায় সেই সুন্দরী! সে নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে, রাজার নিজের চোখে দেখার ইচ্ছা হল। দুজনে আবার গেলেন সেখানে, মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করলেন।

বেরিয়ে আসতেই আবার সেই সুন্দরী দেখা দিল। গুণাধিপ দেখতে বড় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সে বলল, 'মহারাজ, আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তাই করব।'

রাজা বললেন, 'বেশ, তাহলে আমার প্রিয় পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে কর।' আসলে সুন্দরীর রাজাকেই বেশি পছন্দ ছিল, কিন্তু কথা যখন দিয়েছেন তিনি যা বলবেন তাই করবেন, তখন সে আর আপত্তি করল না।

রাজা তাদের বিয়ে দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন আর যাতে তারা চিরঞ্জীবের রোজগারে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, সেই রকম ব্যবস্থা করে

দিলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ, রাজা আর চিরঞ্জীব, এদের মধ্যে কে বেশি মহৎ আর উদার?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'চিরঞ্জীব।' বেতাল বলল, 'কেন?' রাজা উত্তর দিলেন, 'যদিও গুণাধিপ শেষের দিকে চিরঞ্জীবের অনেক উপকার করেছিলেন, তবু শিকারের দিন বনের মধ্যে তাঁকে জল, ফল, আশ্রয় দিয়ে চিরঞ্জীব যে উপকার করেছিল, তার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না।'

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল চলে গেল গাছে ঝুলতে, আর বিক্রমাদিত্য তাকে পেড়ে, কাঁধে তুলে, আবার যোগীর আশ্রমের দিকে চললেন। বেতালও নতুন গল্প আরম্ভ করল।

৯ম গল্প

সেকালে মগধপুর বলে এক রাজ্যের রাজার নাম ছিল বীরবর। বীরবরের প্রজাদের মধ্যে হিরণ্যদত্ত বলে এক বণিক ছিলেন। তাঁর মদনসেনা বলে এক সুন্দরী মেয়ে ছিল।

একবার বসন্তোৎসবের সময় সুন্দর সাজগোজ করে মদনসেনা তার সখীদের সঙ্গে উপবনে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় ধর্মদত্ত বণিকের ছেলে সোমদত্ত তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সোমদত্তের বড় ইচ্ছা মদনসেনা তাকে বিয়ে করে।

মদনসেনা খুব ধীর স্থির বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল, সে অনেক করে সোমদত্তকে বুঝিয়ে বলল যে তা হয় না। অন্য পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে, আর মাত্র পাঁচ দিন পরে বিয়ে হবে।

এ কথা শুনে সোমদত্ত এমনি ভেঙে পড়ল যে মদনসেনার বড় দুঃখ হল। শেষ পর্যন্ত সে কথা দিল যে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবার আগে সোমদত্তের সঙ্গে দেখা করে যাবে।

পাঁচ দিন পরে মদনসেনার বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে। রাতে অতিথিরা চলে গেলে, তার স্বামী তাকে অনেক স্নেহের কথা বললেন, কিন্তু মদনসেনা মাথা থেকে পা অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে চুপ

করে বসে রইল।

তার স্বামী যখন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, মদনসেনা তাঁকে সোমদত্তের কথা খুলে বলল। তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে, সেকথাও বলল। এ কথা শুনে তিনি প্রথমে বারণ করলেন। পরে ওর আগ্রহ দেখে বললেন, 'নেহাৎই যদি যাবে তো যাও। কথা দিলে কথা রাখাই উচিত।'

মদনসেনা স্বামীর অনুমতি পেয়ে আর দেরি করল না। চাদর মুড়ি দিয়ে রওনা হয়ে গেল। পথে একটা চোর তার সামনে এসে বলল, 'তোমার কি ভয়-ডর নেই ঠাকরুণ, এক গা গয়না পরে একলা বেরিয়েছ? এবার গয়নাগুলো আমাকে চট্‌পট্‌ দিয়ে দাও তো দেখি।'

মদনসেনা তখন তাকে সব কথা বলে বলল, 'ভাই, সোমদত্তকে কথা দিয়েছি বলে দেখা করতে যাচ্ছি। স্বামী অনুমতি দিয়েছেন। আমি এখনি ফিরে আসব, তখন গয়নাগুলো দিয়ে দেব, কথা দিলাম।'

চোর তার কথা বিশ্বাস করে, সেইখানে বসে রইল।

এদিকে মদনসেনা সোমদত্তর বাড়ি গিয়ে দেখে সে ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগিয়ে দিতেই সোমদত্ত ভারি অবাক হয়ে গেল।

মদনসেনা বলল, 'তোমাকে কথা দিয়েছিলাম দেখা করে যাব, সেই কথা রাখতে এসেছি। স্বামী মত দিয়েছেন।'

সোমদত্ত বলল, 'তাঁকে সব কথা বলেছ?'

'বলেছি।' তখন সোমদত্ত বলল, 'তুমি যে কথা দিয়ে এভাবে কথা রাখ, তাই দেখে বড় খুশি হলাম। তোমার স্বামী অনুমতি দিয়েছেন, তিনিও খুব মহৎ। তুমি নিরাপদে ফিরে যাও।'

ফিরবার পথে আবার চোরের সঙ্গে দেখা। চোর জানতে চাইল সে এত তাড়াতাড়ি ফিরল কি করে। সব কথা শুনে চোর বলল, 'তোমার সব গয়না নিয়ে নিরাপদে স্বামীর কাছে ফিরে যাও। তোমার মতো ধর্মপরায়ণা মেয়ের দেখা পেয়েই আমার মন ভরে গিয়েছে।'

অবশেষে স্বামীর কাছে গিয়ে মদনসেনা দাঁড়াল। এই ব্যাপারে তিনি খুব খুশি হননি। চুপ করে শুয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'মহারাজ, এবার বল এই চারজনের মধ্যে কার ভদ্রতা সবচেয়ে বেশি।'

রাজা বললেন, 'চোরের।' বেতাল বলল, 'তা কেন?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মদনসেনার স্বামী খুশি মনে তাকে অনুমতি দেননি, বরং খুব বিরক্তি দেখিয়েছিলেন। তাকে ভদ্রতা বলে না। সোমদত্ত আগে অত আগ্রহ দেখিয়ে, শেষে মদনসেনাকে রাতে অন্ধকারে একা যেতে দিল, সেও খুব ভদ্রতা হয়নি। মদনসেনা নিজেও খুব ভদ্রতা দেখায়নি, স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে ওভাবে বেরিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু চোরের কাজই হল সুবিধা পেলেই অন্যের গয়না ইত্যাদি হস্তগত করা। সে এমন সুযোগ পেয়েও মদনসেনার প্রতি শ্রদ্ধা আর সহানুভূতির জন্য কিছু নেবার চেষ্টাও করল না। এ তো খুব মহৎ ভদ্রতা।'

উত্তর শুনেই বেতাল সটাং শ্মশানে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল আর বিক্রমাদিত্যও তাকে নামিয়ে নিয়ে আবার রওনা দিলেন।

বেতাল দশম গল্প শুরু করল।

১০ম গল্প

গৌড়দেশে বর্ধমান বলে এক নগর আছে। সেকালে সেখানে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। অভয়চন্দ্র বলে তাঁর একজন বৌদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী তাকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানান উপদেশ দিতেন। তাঁর কথা শুনে শুনে গুণশেখরের মনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাল। তিনিও বৌদ্ধ হলেন।

বৌদ্ধ হয়েই তিনি পুরনো হিন্দু ক্রিয়াকর্ম পূজো ইত্যাদি বন্ধ করে দিলেন। পূজো-আচ্চা, গো-দান, ভূমি-দান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সব কিছু বেআইনী হয়ে গেল। কেউ ওসব পালন করলে তার কঠোর সাজা হত। ভয়ের চোটে সবাই প্রকাশ্যে ওসব বন্ধ করল।

অভয়চন্দ্র গুণশেখরকে বলতেন, 'সব ধর্মের উপরে অহিংসা ধর্মের স্থান। বিশাল হাতি থেকে খুদে পোকামাকড় পর্যন্ত সকলের প্রাণ আছে, সে প্রাণ নেবার অধিকার কারো নেই। যারা জানোয়ার মেরে মাংস খায়, তাদের পরজন্মে ভীষণ কষ্ট পেতে হয়। যেমন মাংস খাওয়া, তেমনি মদ খাওয়াও মহা পাপ। সবাই নিরামিষ খাবে, মদ ছাড়বে, তবেই

তাদের আয়ু বিদ্যা বল ধন সব কিছু বাড়বে।'

রাজার বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস এমন গভীর ছিল যে কেউ যদি তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা করত, তিনি তাকে পুরস্কার দিতেন। এই ভাবে রাজা

বৌদ্ধধর্মের প্রচার করতেন।

তারপর সময় হলে গুণশেখর মারা গেলেন। তাঁর ছেলে ধর্মধ্বজ রাজা হলেন। ইনি ছিলেন বাপের ঠিক উল্টো। বৌদ্ধধর্মে তাঁর এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের ভক্ত। তিনি বৌদ্ধদের ধরে কঠিন সাজা দিতে লাগলেন। আগেই বেচারা অভয়চন্দ্রের মাথা মুড়িয়ে, উল্টো গাধায় চাপিয়ে, শহর ঘুরিয়ে, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রজারা তখন আবার হিন্দুধর্মে আস্থা দেখাতে লাগল।

ধর্মধ্বজের তিন রানী। বসন্তোৎসবের সময় রাজা তাঁদের নিয়ে উপবনে বেড়াতে গেলেন। সেখানে এক পুকুর, পুকুরে অনেক পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। রাজা নিজের হাতে কয়েকটি পদ্ম তুলে একজন রানীকে দিলেন। কিন্তু কেমন করে একটা ফুল রানীর বাঁ পায়ের উপর পড়ে গেল। রানী বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলেন। ফুলের ঘায়ে পা-টি তাঁর ভেঙে গিয়েছিল। রাজা নানা উপায়ে তাঁকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে। চারদিক জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। চাঁদের আলো লেগে দ্বিতীয় রানীর গায়ে ফোস্কা পড়ল। আহা! তার কি কষ্ট!

ঠিক সেই সময় এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে হামানদিস্তার শব্দ শোনা গেল। তৃতীয় রানী তাই শুনে পতন ও মূর্ছা!

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'মহারাজ, তাহলে এঁদের তিনজনের মধ্যে কার শরীর সবচেয়ে কোমল?'

রাজা বললেন, 'ঐ যার গায়ে জ্যোৎস্না লেগে ফোস্কা পড়ল, আমার মতে তারই শরীর সবচেয়ে কোমল।'

বলামাত্র বেতাল হু-হু করে আবার শিরীষ গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল, রাজাও আবার তাকে পেড়ে রওনা দিলেন।

বেতাল তার পরের গল্প শুরু করল।

১১শ গল্প

সেকালে পুণ্যপুর বলে এক শহর ছিল। তার রাজার নাম ছিল বল্লভ

তিনি এত ভালো রাজা ছিলেন যে প্রজারা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করত। দান-ধ্যান, দুঃখীর দুঃখ দূর করা—এইসব সৎকাজে তাঁর দিন কাটত।

কিন্তু একদিন তিনি তাঁর মন্ত্রী সত্যপ্রকাশকে ডেকে বললেন, 'দেখ, যে মানুষ রাজা হয়ে জন্মেও খালি পরের জন্য খেটে মরে, এই যে পৃথিবীতে এত আমোদ আহ্লাদ, সুখের জিনিস, শখের জিনিস, এর খুব অল্পই ভোগ করে, সে বড় বোকা। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে দিন-রাত নানা রকম সুখ-ভোগে সময় কাটাব। প্রজাপালন করবে তুমি।'

শুনে মন্ত্রীর তো চক্ষুস্থির। বলেন কি রাজা! মন্ত্রীর কি সে বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, নাকি সে মনের তেজ, কি শরীরের বল, কি বিচার-বুদ্ধি বা ধৈর্য আছে, যে একা হাতে রাজকার্য চালাবেন!

কিন্তু রাজা তাঁর কোনো কথাতেই কান দিলেন না। অগত্যা মন্ত্রী আর কি করেন, তাঁর যতখানি সাধ্য সেইমতো কাজ করে যেতে লাগলেন। এতখানি দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ভাবনায় চিন্তায় তিনি ক্রমে বড়ই মনমরা হয়ে পড়লেন।

শেষটা তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে, তাঁর স্ত্রী বললেন, 'দেখ, এসব কাজ একলা করা তোমার অভ্যাস নেই, তাই দিনে দিনে তোমার শরীর মন দুই-ই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বরং এক কাজ কর, সব ছেড়েছুড়ে তীর্থে বেরিয়ে পড়।'

সত্যপ্রকাশ তখন স্ত্রীর পরামর্শমতো রাজার কাছে বিদায় নিয়ে তীর্থে বেরোলেন। শেষ পর্যন্ত নানা দেশে ঘুরে রামেশ্বরে পৌছলেন। সেখানে রামের তৈরি শিবমন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করে, পূজো দিয়ে বেরিয়েই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিশাল এক সোনার গাছ বেরোল। গাছের মাথায় বসে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে চমৎকার বীণা বাজাচ্ছেন আর মধুর কণ্ঠে দক্ষ ওস্তাদের মতো গান গাইছেন। মন্ত্রীর চোখের সামনেই এক সময়ে গাছটি আস্তে আস্তে আবার ঢেউয়ের নিচে নেমে গেল।

এর পর কি আর তিনি স্থির থাকতে পারেন? সোজা রাজা বল্লভের কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা বললেন। এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কথা শুনে

রাজা আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না। মন্ত্রীর হাতে আবার রাজ্যভার দিয়ে রামেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সেখানে গিয়ে মন্ত্রী যা যা দেখেছিলেন, রাজাও তার সবই দেখলেন। তফাত শুধু এই যে সোনার গাছটি সুন্দরীকে নিয়ে যেই ডুবে গেল, রাজাও অমনি জলে ডুব দিয়ে, দেখতে দেখতে গাছটাকে ধরে ফেলে, তার মগ-ডালে উঠে বসলেন। গাছটাও তাঁকে সুদ্ধ সুন্দরীকে নিয়ে পাতালে পৌঁছল।

পাতালে গিয়ে সেই মেয়েটি বলল, 'তুমি তো বড় সাহসী! কে তুমি? এখানে কেন এসেছ?'

রাজা বললেন, 'আমি পুণ্যপুরের রাজা, বল্লভ। তোমার রূপগুণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি!'

মেয়েটি বলল, 'আমিও তোমাকে দেখে বড়ই খুশি হয়েছি। আমি তোমার রানী হতে পারি, যদি অমাবস্যার দিন তুমি আমার ধারেকাছে কোথাও না থাক। এই রকম কথা দিতে হবে।'

রাজা কথা দিলেন। তখন গন্ধর্বমতে দুজনার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর কিছুদিন আনন্দে কাটল। তারপর অমাবস্যা এল। রাজা তখন তাঁর কথামতো রানীর মহল থেকে চলে গেলেন।

চলে গেলেন বটে, কিন্তু রানীর কাতর ভাবটা তাঁর চোখে পড়েছিল। তাই রাত গভীর হলে তিনি লুকিয়ে তলোয়ার হাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক মাঝরাতে একটা রাক্ষস এসে রানীকে ধরতে গেল, অমনি রাজাও হুংকার দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

রানী তখন জলভরা চোখে তাঁকে বললেন, 'এই নিষ্ঠুর রাক্ষসের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচালে। আমি গন্ধর্ব রাজার মেয়ে রত্নমঞ্জরী। বাবা আমাকে বড় ভালোবাসতেন। আমি কাছে এসে না বসলে তাঁর খাওয়া হত না। একদিন আমি খেলা নিয়ে এমনি মেতে ছিলাম যে বাবার খাওয়ার সময় কাছে যাইনি। রাগ করে বাবা আমাকে শাপ দিয়েছিলেন, "তোকে পাতালে বাস করতে হবে আর প্রত্যেক অমাবস্যায় একটা রাক্ষস এসে তোকে নানা রকম কষ্ট দেবে।" কত পায়ে ধরে কেঁদে

বললাম, "বাবা আমাকে ক্ষমা কর। ছোট অপরাধে, এমন কঠিন সাজা দিও না।" তখন বাবা বললেন, "বেশ। একদিন এক বীরপুরুষ এসে রাক্ষস মেরে তোকে উদ্ধার করবেন।" তুমিই সেই বীরপুরুষ। এখন আমি একবার বাবার কাছে যাই।'

রাজা বললেন, 'আগে আমার রাজধানীতে চল, তারপর বাবার কাছে যেও।' কিন্তু কিছুকাল পরে যখন রাজা বললেন, 'এবার তোমার বাপের বাড়ি যাবার আয়োজন করি।' তখন রত্নমঞ্জরী বললেন, 'মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমার গন্ধর্ব ভাব ঘুচে গেছে। আমি এখানেই থাকতে চাই।'

এ কথা শুনে রাজার বড়ই আহ্লাদ হল। তিনি আবার রাজকার্য মন্ত্রীর হাতে দিয়ে, আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাতে লাগলেন।

তাই দেখে মন্ত্রী মনের দুঃখে মারা গেলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ, মন্ত্রী মরল কেন?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তাঁর বোধহয় মনে হল রাজা আর রাজকার্যে মন দেবেন না। প্রজাদের সুখ সুবিধা কেউ দেখবে না। সব দোষ পড়বে মন্ত্রীর ঘাড়ে। এভাবে দুশ্চিন্তার মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভালো।'

তাই শুনে বেতাল সটাং শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার গাছে ঝুলে পড়ল আর বিক্রমাদিত্য তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে যোগীর আশ্রমের দিকে চললেন।

বেতাল অমনি তার পরের গল্প শুরু করল।

১২শ গল্প

সেকালে চূড়াপুরে দেবস্বামী বলে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। রূপে গুণে তিনি যেমন অসাধারণ ছিলেন, ধন-সম্পত্তিও তাঁর তেমনি ছিল। দেবস্বামীর স্ত্রী লাবণ্যবতীও সব দিক দিয়ে তাঁর স্বামীর উপযুক্ত ছিলেন। সুন্দর প্রাসাদের মতো বাড়িতে তাঁরা বড় সুখে দিন কাটাতেন।

একবার দারুণ গ্রীষ্মের রাতে ঘরের মধ্যে টিকতে না পেরে, তাঁরা বাড়ির ছাদে বিছানা পেতে শুয়েছিলেন। গভীর রাতে দুজনে ঘুমিয়ে পড়লে পর এক গন্ধর্ব তার বিমানে চড়ে ঐ পথে যাচ্ছিল। বাড়ির ছাদে

অমন সুন্দর মেয়ে দেখতে পেয়ে, সে তাকে বিমানে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেবস্বামীর ঘুম ভাঙল। স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। কিন্তু বাড়িময় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না দেখে, পাগলের মতো হয়ে উঠলেন।

সকাল হলে, চারদিকে খোঁজ পড়ে গেল। দুঃখের বিষয় লাবণ্যবতীর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়ে, দেবস্বামী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি দুপুর বেলায় এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। খিদে-তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কাছেই এক ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখে, সেখানে গিয়ে খাবার আর জল চাইলেন। গৃহস্থও ব্যস্ত হয়ে এক বাটি দুধ এনে তাঁর হাতে দিলেন।

এদিকে এর অল্পক্ষণ আগেই একটা বিষাক্ত সাপ ঐ দুধে মুখ দিয়েছিল। তার দাঁতের বিষ দুধে মিশে গিয়েছিল।

দুধ খাওয়ামাত্র দেবস্বামীর শরীর বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন তাঁর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। তখন তিনি দুঃখের সঙ্গে ব্রাহ্মণকে বললেন, 'তুমি আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে!' এই বলে মারা গেলেন।

ক্ষোভে, দুঃখে গৃহস্থ ঘরে গিয়ে নির্দোষ স্ত্রীকে যা নয় তাই বলে, বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

এইখানে গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'বল মহারাজ, এদের মধ্যে দোষী কে?'

রাজা বললেন, 'প্রকৃতিই সাপের মুখে বিষ দিয়েছে, কাজেই সাপের কোনো দোষ হয়নি। গৃহস্থ আর তাঁর স্ত্রী বিষের কথা কিছুই জানতেন না, কাজেই তাঁদেরও দোষ হয়নি। অতিথিও না জেনে দুধ খেয়েছিলেন, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা ছিল না, কাজেই তাঁরও কোনো দোষ হয়নি। তবে একটা দোষ হয়েছিল বৈকি! ঐ গৃহস্থ কোনো খোঁজ-খবর না নিয়েই নিরপরাধ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘোর অন্যায় করেছিলেন।'

শুনেই বেতাল আবার গিয়ে গাছে ঝুলল আর রাজা তাকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে, আবার রওনা দিলেন।

বেতালও তার ত্রয়োদশ গল্প শুরু করল।

১৩শ গল্প

সেকালে চন্দ্রহৃদয় নগরে গুণধর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর মতো সৎ ও দয়ালু রাজা কম ছিল। প্রজারা বড় সুখে থাকত। হঠাৎ সেই রাজ্যে চোরের উপদ্রব শুরু হল। কারো কিছু রাখবার জো রইল না, কোন ফাঁকে চোর এসে সব নিয়ে পালাত। দিনে দিনে চোরের সাহস বেড়েই যেতে লাগল।

শেষে প্রজারা রাজার কাছে দরবার করল। 'মহারাজ, আমরা যে ক্রমে একেবারে পথের ভিখারি হয়ে যাচ্ছি। আপনি ছাড়া কে আমাদের রক্ষা করবেন?'

রাজা ব্যস্ত হয়ে শহরের চৌকিদারের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিলেন। তাতে কোনো লাভই হল না। চুরি বেড়ে গেল। তখন রাজা ঠিক করলেন, তিনি নিজেই নগর চৌকি দিয়ে চোর ধরবেন।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, রাজা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই একটা লোকের সঙ্গে দেখা। রাজা বললেন, 'এই, তুই কে রে?' লোকটা বলল, 'চোর ছাড়া আবার কে। তুই কে রে?' রাজা বললেন, 'আমিও চোর।'

তাই শুনে চোর মহা খুশি। 'তবে চল, দুজনে মিলে ঐ বড়লোকের বাড়ি থেকে কিছু হাতানো যাক।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। দেখতে দেখতে দক্ষ হাতে সিঁদ কেটে ভিতরে ঢুকে টাকাকড়ি, সোনাদানা যা যেখানে পেল সব নিয়ে চোর পিট্টান দিল। রাজা তাজ্জব বনে গেলেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চোর রাজধানীর বাইরে একটা বনের মধ্যে গোপন একটা সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়াল।

চোরের কথায় তার সঙ্গে রাজাও সুড়ঙ্গে ঢুকে, একেবারে পাতালে

গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে দিব্যি এক শহর দেখে রাজা অবাক হলেন। নিজের বাড়িতে পৌঁছে রাজাকে বাইরে বসিয়ে, চোর ভিতরে গেল। একটু পরে এক ঝি এসে রাজাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি এখানে কি করছ ? জান না এটা একটা পাষণ্ড ডাকাতের বাড়ি ? বাঁচতে চাও তো এই বেলা পালাও।'

রাজা বললেন, 'মাটির তলায় এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার পথ তো আমি জানি না।' ঝি তাঁকে পথ দেখিয়ে দিল।

পরদিন সকালে রাজা লোকজন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে সেই-খানে গিয়ে চোরের বাড়ি ঘেরাও করলেন। তাই দেখে চোর ঐ নগর রক্ষক এক বিকট রাক্ষসের কাছে রাশি রাশি খাবার জিনিস নিয়ে কেঁদে পড়ল, 'এই বিপদে তুমি আমাকে রক্ষা না করলে আমাকে এখানকার পাট তুলতে হবে।'

রাক্ষস বলল, 'এই কথা ? আমি এক্ষুনি এর একটা উপায় করছি।' এই বলে ছুটে এসে কপাকপ লোকজন হাতী-ঘোড়া যা পেল একেক গ্রাসে গিলে খেতে লাগল। যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালাল। যারা পালাতে পারল না, তারা রাক্ষসের পেটে গেল।

রাজাও বেগতিক দেখে পাঁই-পাঁই করে ছুটতে লাগলেন। রাক্ষসের আস্কারা পেয়ে চোরের বড় সাহস বেড়েছিল। সে রাজাকে তাড়া করে গেল আর যা নয় তাই বলে টিট্‌কিরি দিতে লাগল। রাজা তখন ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। বলা বাহুল্য ঐ যুদ্ধে রাজা জয়ী হলেন। চোরকে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তার বিচার হল। বিচারে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। কারণ রাজ্যসুদ্ধ সকলের উপরেই সে অনেক দিন ধরে অত্যাচার করেছে, সবাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল।

চোরকে তখন গাধার পিঠে চাপিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। পথে ধর্মধ্বজ বণিকের বাড়ি। তাঁর মেয়ে শোভনা জানলা দিয়ে চোরকে ওভাবে দেখতে পেয়ে, বাবাকে গিয়ে বলল, 'ঐ লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ে না দিলে, আমি আত্মহত্যা করব।'

ধর্মধ্বজ রাজাকে গিয়ে বললেন, 'ঐ চোরকে ছেড়ে দিলে, আমার

লক্ষ লক্ষ টাকা সব আপনাকে দেব।'

রাজা বললেন, 'তা হয় না। ঘোর অন্যায় করেছে বলে বিচারপতিরা ওর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।' চোর এ-কথা শুনে একবার হাসল, তার পরেই একবার কাঁদল। এরপর তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ানো হল। বণিকের মেয়ে যেই শুনল চোর মারা গেছে, সেও সেখানে গিয়ে চিতা সাজিয়ে, চোরের মৃতদেহের সঙ্গে তাতে চড়ে বসল।

পাশে কাত্যায়নীদেবীর মন্দির। শোভনার নিষ্ঠা দেখে দেবী প্রসন্ন হয়ে দেখা দিয়ে বললেন, 'বর চাও, বাছা।' শোভনা বলল, 'তাহলে একে বাঁচিয়ে দাও মা।' তখন দেবীর বরে চোর বেঁচে উঠলো।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'বল মহারাজ, চোর কেন আগে হাসল, পরে কাঁদল।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'হেসেছিল কারণ তার মনে হয়েছিল ভগবানের এ আবার কি খেলা; আমি মরতে যাচ্ছি আর ঐ মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়! তারপর কেঁদেছিল এই ভেবে যে এই মেয়ে আমার জন্য সব দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার মতো একটি অভাগা তার জন্য কি বা করতে পারতাম!'

আবার ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল তীর বেগে শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে পড়ল আর রাজা তাকে তখুনি নামিয়ে আবার রওনা দিলেন। তখন বেতাল তার চতুর্দশ গল্প শুরু করল।

১৪শ গল্প

সেকালে একদিন কুসুমবতী নগরের রাজা সুবিচারের পরমা সুন্দরী মেয়ে চন্দ্রপ্রভা রাজধানীর কাছেই উপবনে সখীদের নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগে মনস্বী নামে একজন যুবক পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে, উপবনের এক কুঞ্জের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মনস্বী দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন।

এদিকে সখীদের সঙ্গে রাজকুমারীও ঐখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের হাসি, গল্প আর নূপুরের রুনুঝুনু কানে যেতেই মনস্বীর ঘুম ভেঙে গেল।

তিনি অমনি উঠে বসে, চন্দ্রপ্রভাকে দেখতে পেলেন। এমন সুন্দর মেয়ে তিনি কখনো দেখেননি।

রাজকুমারীও এমন রূপবান পুরুষ কখনো দেখেননি। দুজনার দু-জনকে ভালো লাগল। সখীরা কিন্তু কুঞ্জবনে অচেনা যুবককে দেখে, চন্দ্র-প্রভাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। রাজকুমারী চলে যেতেই নিদারুণ হতাশায় মনস্বী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

সেই সময় শশী আর ভূদেব বলে দুজন পথিক সেখানে পৌঁছল। তারা কামরূপ থেকে নানা রকম অদ্ভুত বিদ্যা শিখে দেশে ফিরছিল। মনস্বীকে দেখে তাঁর চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে তারা তাঁর জ্ঞান ফেরাল। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করল কেন তিনি পথের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

খানিকটা পেড়াপীড়ি করতেই মনস্বী রাজকুমারীর কথা বললেন। আরো বললেন, 'ঐ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি বাঁচব না।'

ভূদেব বলল, 'আমার সঙ্গে চল তো, দেখবে আমি কেমন সব ব্যবস্থা করে দিই।' এই বলে তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে এক অক্ষ-রের আশ্চর্য জাদু মন্ত্র শিখিয়ে দিল। সে মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মনস্বী একজন ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ের রূপ পাবেন। আবার ইচ্ছা করলেই নিজের চেহারা ফিরে পাবেন।

মনস্বী তো মন্ত্রবলে সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেলেন আর ভূদেব হল তাঁর আশী বছরের বুড়ো শ্বশুর। তারা এই ভাবে রাজসভায় গিয়ে হাজির হল। চন্দ্রপ্রভার বাবা বুড়ো ব্রাহ্মণ অতিথি দেখে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন।

বুড়ো বলল, 'এই মেয়ে আমার ছেলের বৌ। আমি ওকে বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে গ্রামে ওলাউঠো দেখা দিয়েছিল। ভয়ে সবাই পালিয়ে গেছে। আমার স্ত্রী আর ছেলেও চলে গেছে। এখন তাদের আমি খুঁজে আনতে যাচ্ছি। আপনি আমার এই ছেলেমানুষ বৌমাটিকে আপনার বাড়ির মেয়েদের কাছে আশ্রয় দিন। আমি তাদের খোঁজ পেলেই ফিরে এসে বৌমাকে নিয়ে যাব।'

পরের মেয়ে ঘরে রাখতে রাজার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিপদে পড়ে বুড়ো ব্রাহ্মণ সাহায্য চাইছেন তাঁকে ফেরানোও তো ঠিক হয় না। সাত-পাঁচ ভেবে রাজা রাজি হলেন। বুড়ো-বেশী ভূদেব তখন বধূ-বেশী মনস্বীকে রেখে বিদায় নিল। রাজাও মেয়েটিকে চন্দ্রপ্রভার জিম্মা করে দিলেন।

চন্দ্রপ্রভা বড় ভালো মেয়ে ছিল। সে এই বেচারিকে নিজের কাছে রেখে সব রকম ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন লক্ষ্মী মেয়ে দেখে তাকে সত্যি ভালোবেসেও ফেলল।

একদিন বৌটি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, তুমি সব সময় মনমরা হয়ে থাক কেন? তোমার কিসের দুঃখ?'

চন্দ্রপ্রভা বলল, 'দুঃখের কথা আর কি বলব। একদিন উপবনে বেড়াতে গিয়ে একজন রূপবান ব্রাহ্মণ যুবককে দেখে আমার বড়ই ভালো লেগেছে। তার সঙ্গে বিয়ে না হলে জীবনে আমার কোনো সুখ নেই। অথচ তাঁর নাম ঠিকানা কিছুই জানি না।'

বৌ তো আসলে বৌ নয়, মনস্বী বৌয়ের চেহারা নিয়ে এসেছেন। এ-কথা শুনে তিনি মহা খুশি হয়ে রাজকুমারীকে বললেন, 'আমি ঐ যুবকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে পারি।' এই বলে মন্ত্রবলে নিজের আসল চেহারা ধরলেন।

তাই দেখে চন্দ্রপ্রভা যেমন আশ্চর্য, তেমনি আহ্লাদিত হল। একে একে মনস্বী তাকে সব কথাই খুলে বললেন। তারপর সখীদের সাক্ষী রেখে গন্ধর্বমতে দুজনার বিয়ে হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে প্রধান মন্ত্রীর বাড়িতে রাজা সুবিচার সপরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। মনস্বী আবার বৌ সেজে রয়েছেন। তাকেও নিয়ে গেলেন। তাতেই হল মুশকিল। মন্ত্রীর ছেলে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে সে ভালো করে খায় না দায় না, আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয় না। তার প্রাণের বন্ধু সব কথা শুনে, মন্ত্রীকে গিয়ে বলল, 'আপনার ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান তো ঐ মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিন।'

মন্ত্রী জানতেন যে মেয়েটির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, তবু ছেলের

দুঃখ দেখে, রাজার কাছে গেলেন। রাজা খুব বিরক্ত হলেন, 'এ কি রকম কথা! ব্রাহ্মণ আমাকে বিশ্বাস করে তাঁর বৌমাকে আমার আশ্রয়ে রেখে গেছেন আর আপনি এ কি বলছেন।'

হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে মন্ত্রীও খাওয়া ঘুম সব ছাড়লেন। দিনে দিনে তাঁর শরীর ভাঙতে লাগল। অন্যান্য সভাসদ্‌রা রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, কোনকালে সে বামুন বৌটাকে রেখে গেছে। বেঁচে থাকলে এতদিনে ফিরে আসত। তারা সবাই নিশ্চয় মরে গেছে, আপনি নির্ভয়ে মন্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করুন। মন্ত্রী মারা গেলে আপনি একা রাজকার্য চালাতে পারবেন না, দেশের সর্বনাশ হবে। আর যদি বামুনের ছেলে ফিরেও আসে, আপনি টাকাকড়ি দিয়ে কোনো ভালো মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

এসব কথা শুনে রাজা ভাবলেন, তাইতো, এরা তো ঠিক কথাই বলেছে।' তখন তিনি বৌটিকে ডেকে মন্ত্রীর প্রস্তাবের কথা বললেন।

বৌ-রূপী মনস্বী বিনীত ভাবে বললেন, 'তা হতে পারে না, মহারাজা। আমার স্বামী আছেন, আপনি কি করে এমন কথা বলতে পারছেন!' এই বলে কেঁদেকেটে সেখান থেকে চলে গিয়ে, মন্ত্রবলে নিজের আসল রূপ ধরে রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন।

পালিয়ে সটাং ভূদেবের বাড়িতে গিয়ে সব কথা বললেন। ভূদেব তখন এক মজা করল। শশীকে ব্রাহ্মণ যুবক সাজিয়ে, রাজসভায় গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আপনি দয়া করে আমার বৌমাকে এতদিন রক্ষা করে-ছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। এখন আমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, কাজেই বৌমাকেও বাড়ি নিয়ে যাই।'

রাজা কি আর করেন, হাতজোড় করে সব বললেন। তখন ভূদেব মহা রাগ দেখিয়ে বলল, 'তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও। নয়তো ব্রহ্মশাপ লাগবে।'

ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাজা তাতেই রাজি হলেন। পুরুত বামুন ডেকে ধুমধাম করে মেয়ের সঙ্গে শশীর বিয়ে দিলেন। ভূদেব চন্দ্রপ্রভাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। সেখানে মনস্বী অপেক্ষা করছিলেন। শশী আর মনস্বী দু-জনেই বলতে লাগল, '—এ মেয়ে আমার স্ত্রী?'

এই অবধি বলে, বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই বল, মহারাজ, ও কার স্ত্রী ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মনস্বীর।'

বেতাল বলল, 'তা কেন ? রাজা তো শশীর হাতেই মেয়ে দিয়েছেন।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যে মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, তাকে কারো হাতে দেবার অধিকার তার বাপের থাকে না।'

ঠিক উত্তর শুনে বেতাল আবার গিয়ে শিরীষ গাছে লটকে রইল আর রাজা তাকে নামিয়ে আবার রওনা দিলেন। বেতাল তার পনেরো সংখ্যার গল্প শুরু করল।

১৫শ গল্প

সেকালে ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে হিমালয়ের গা ঘেঁষে, পুষ্পপুর বলে এক শহর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর ছেলে ছিল না। পরে কল্পবৃক্ষের আরাধনা করে তিনি একটি ছেলে পেয়েছিলেন। ছেলের নাম হলো জীমূতবাহন। যেমন-তেমন ছেলে নয় সে। যেমন দয়ালু, তেমনি বিদ্বান আর ধার্মিক। বাপ-ছেলেতে মিলে সব সময় প্রজাদের মঙ্গলের চেষ্টা করতেন।

কিছুকাল পরে রাজা আবার কল্পবৃক্ষের সাধনা করে, রাজ্যের সব প্রজাদের জন্য সব রকম সুখ সম্পদ চেয়ে নিলেন। কিন্তু হল ঠিক উল্টো। বিনা পরিশ্রমে প্রচুর টাকাকড়ি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে দেশের লোক কুঁড়ে হয়ে তো গেলই, তার উপরে কুমতলবী, অহংকারী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল।

তখন রাজ-পরিবারের কয়েকজন জ্ঞাতি রাজাকে সরাবার উদ্দেশ্যে প্রজাদের এই বলে উস্কে দিতে লাগল যে এ রাজার রাজকার্যে মন নেই, ধর্ম-কর্ম করেই গেল। এর জায়গায় অন্য কেউ রাজা হোক এর ফলে বোকা প্রজারাও যে ক্ষেপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? তারা রাজবাড়ি ঘেরাও করল।

তখন জীমূতবাহন রাজাকে বললেন, 'আর সহ্য করা যায় না। এবার যুদ্ধ করে এদের হটিয়ে, উপযুক্ত সাজা দেওয়াই উচিত।'

রাজা তবু মত দিলেন না। বললেন, আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া করা মহাপাপ। তার বদলে বাপ-ছেলে রাজ্য ছেড়ে, মলয় পর্বতে গিয়ে, পাতার কুঁড়ে তৈরি করে, তপস্যা করতে লাগলেন।

কুঁড়ে ঘরের কাছেই কাত্যায়নীর মন্দির। একদিন সেখান থেকে বীণার শব্দ আর মধুর গান শুনে জীমূতকেতু আর জীমূতবাহন সেখানে না গিয়ে পারলেন না। মন্দিরে মলয়রাজের মেয়ে মলয়বতী বীণার সঙ্গে গান গেয়ে দেবীর আরাধনা করছিলেন। পূজার পর জীমূতবাহনের উপর তাঁর চোখ পড়ল আর তখনি মনে মনে তাঁকে নিজের স্বামী বলে বরণ করে নিলেন। কোনো কথাবার্তা হল না বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরে সখীরা রানীর কাছে জীমূতবাহনের কথা জানাল।

মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছিল, পাত্রও দেখা হচ্ছিল। মলয়রাজ জীমূতবাহনের পরিচয় জানতে পেরে, তাঁর বাবার কাছে নিজের ছেলে মিত্রাবসুকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। জীমূতকেতুও আনন্দের সঙ্গে মত দিলেন। মিত্রাবসু জীমূতবাহনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। মহা ধূম-ধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। তারপর মলয়বতী আর জীমূতবাহন পরম সুখে কিছুকাল কাটালেন।

একদিন মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়পর্বতের উত্তর দিকে বেড়াতে বেড়াতে জীমূতবাহন একটা প্রকাণ্ড সাদা ঢিবি দেখে বললেন, 'ওটা কি?' মিত্রাবসু বললেন, 'সেকালে গরুড়ের সঙ্গে নাগদের মহা যুদ্ধ হয়েছিল। নাগরা হেরে গেলে, গরুড় বলেছিলেন, "সাপ আমার খাদ্য। যদি রোজ একটি সাপ খেতে পাই, তাহলে বাকিদের আমি কিছু বলব না। নইলে কেউ বাঁচবে না।"

সেই থেকে পালা করে রোজ একটি নাগ এখানে আসে আর গরুড় তাকে খেয়ে হাড়গুলো ওখানে ফেলে দেন। সেই হাড় জমে জমে কেমন একটা সাদা পাহাড় তৈরি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ।'

এ-কথা শুনে জীমূতবাহনের বড় দুঃখ হল। মিত্রাবসুকে অন্য কথা বলে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ঐ সাদা পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখেন এক বুড়ি নাগিনী বুক চাপড়ে কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নাগিনী বললেন, 'আজ গরুড় আমার ছেলে শঙ্খচূড়কে খাবেন, তাই কাঁদছি।'

জীমূতবাহন বললেন, কেঁদ না মা, শঙ্খচূড়ের বদলে আমি যাব।' বুড়ি বললেন, 'তা হয় না, তাহলে আমার পাপ হবে।' শঙ্খচূড়-ও এসে সেই কথাই বলল। কিন্তু জীমূতবাহন কোনো কথা শুনলেন না। বললেন,

'আমি ক্ষত্রিয়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি নিজের প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচাব। ক্ষত্রিয়রা কখনো প্রতিজ্ঞা ভাঙে না। আমি কোনো কথা শুনবো না।'

শঙ্খচূড় তখন নিদারুণ দুঃখে, কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, দেবী যাতে ঐ দয়ালু পুরুষকে রক্ষা করেন।

এদিকে গরুড় এসে, কিছুই লক্ষ্য না করে ছোঁ মেরে জীমূতবাহনকে ঠোঁটে তুলে আকাশে উড়লেন। জীমূতবাহনের তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। তাঁর হাত থেকে রক্তমাখা কেয়ূর খসে দৈবাৎ একেবারে মলয়বতীর সামনে পড়ল। তিনিও সেটি চিনতে পেরে কেঁদে উঠলেন, রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

মলয়কেতু আর মিত্রাবসু জীমূতবাহনকে খুঁজতে বেরোলেন। শঙ্খচূড়ও হট্টগোল শুনে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে, আবার সেই সাদা পাহাড়ের কাছে ফিরে গেল। সেখান থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওহে পাখিদের রাজা, তুমি শঙ্খচূড় ভেবে রাজা জীমূতবাহনকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? ফিরে এসে আমাকে খাও।'

কথাটা গরুড়ের কানে যেতেই, তিনি চমকে উঠে জীমূতবাহনকে বললেন, 'তাই তো! তুমি তো নাগ নও। তাহলে তুমি কে?'

তারপর জীমূতবাহনের মুখে সব কথা শুনে বড় আনন্দিত হয়ে গরুড় বললেন, 'সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় আর তুমি অন্যের প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিতে চাইছ! এমন স্বার্থত্যাগী মানুষ তো চোখে পড়ে না। বর নাও।'

জীমূতবাহন হাতজোড় করে বললেন, 'যদি সত্যি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে কথা দিন আর কখনো সাপ খাবেন না আর এতদিন ধরে যাদের হাড় এখানে জমা করেছেন, তাদেরও আবার বাঁচিয়ে দেবেন।'

গরুড় বললেন, 'তাই হবে।' এই কথা বলে পাতাল থেকে অমৃত এনে, হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন। লক্ষ লক্ষ সাপ জ্যান্ত হয়ে কিলবিল করে পালাল। জীমূতবাহনও শঙ্খচূড়কে আশীর্বাদ করে জীমূতকেতুর কুটিরে গেলেন। তখন বুড়ো রাজার আনন্দ দেখে কে!

এই সুখবর শুনে মলয়রাজের প্রাসাদেও আনন্দ কোলাহল লেগে

গেল। এদিকে পুষ্পপুর থেকে বিদ্রোহী প্রজারা আর আত্মীয়রা কাঁদতে কাঁদতে এসে জীমূতকেতুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। রাজার মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। তিনি তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে আবার নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'এবার বল, জীমূতবাহন আর শঙ্খচূড়, এই দুজনের মধ্যে কে বেশি মহৎ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শঙ্খচূড়। কারণ পরের জন্য প্রাণ দিতে যাওয়া, দেবতুল্য কাজ হলেও সেই হল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। জীমূতবাহন তার বেশি কিছু করেননি। কিন্তু শঙ্খচূড় হল জাতে সাপ, প্রাণ নেওয়াই তার কাজ। অথচ জীমূতবাহন তার জন্য প্রাণ দিচ্ছে, এটা সইতে না পেরে, আগে কাত্যায়নীর পায়ে পড়ে গরুড়কে ডেকে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিয়ে, জীমূতবাহনকে বাঁচিয়ে সে নিজে মরতে প্রস্তুত ছিল।'

এমন ন্যায্য উত্তর শুনেই বেতাল শ্মশানে ফিরে গাছে ঝুলে পড়ল। বিক্রমাদিত্যও তাকে গাছ থেকে পেড়ে, কাঁধে তুলে আবার রওনা দিলেন। তখন বেতাল তার ষোড়শ গল্প আরম্ভ করল।

১৬শ গল্প

সেকালে চন্দ্রশেখর নগরের রত্নদত্ত বণিকের উন্মাদিনী বলে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। রত্নদত্ত ভাবলেন, 'এ মেয়ে রাজার রানী হবার উপযুক্ত। অবিশ্যি রাজা এ প্রস্তাবে রাজি না হলে, অন্য পাত্র দেখতে হবে।'

এই মনে করে তিনি রাজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। মেয়ে দেখতে রাজা কয়েকজন মন্ত্রীকে পাঠালেন। মন্ত্রীরা দেখলেন এমন মেয়ে মানুষের ঘরে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁদের ভয় হল এর সঙ্গে বিয়ে হলে, রাজা অন্তঃপুরেই দিন কাটাবেন, রাজকার্য দেখবেন না। দেশের লোকের কষ্ট বাড়বে। এই মনে করে ফিরে এসে তাঁরা বললেন, 'না মহারাজ, রূপে গুণে ও মেয়ে আপনার যোগ্য হবে না।' বিয়ের সম্বন্ধ হল না। রত্নদত্ত তখন রাজার বীর সেনাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্মার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। তারা বড় সুখে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন রাজা রাজধানী দেখতে বেরিয়েছেন, এমন সময় দেখেন বলভদ্রের বাড়ির দোতলায় পরমাসুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন এ মেয়েই রত্নদত্তের কন্যা, বলভদ্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। রাজা বুঝতে পারলেন মন্ত্রীরা তাঁকে ঠকিয়েছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন, 'অমন সুন্দর মেয়ে ঘরে আনলে, আপনি ঘর থেকে বেরোতেন না। দেশে অরাজকতা উপস্থিত হত।'

এ-কথা শুনে রাজা রাগ করলেন না বটে, কিন্তু কি অপরূপ স্ত্রী হারিয়েছেন, তাই ভেবে তাঁর শরীর মন ক্রমে খারাপ হয়ে যেতে লাগল। কথাটা প্রভুভক্ত বলভদ্রের কানেও পৌঁছল। তিনি রাজার কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'মহারাজ, আমার যা কিছু আছে, সবই আপনার। টাকাকড়ি, মানসম্মান, স্ত্রী পুত্র পরিবার কিছুই আমার নিজের নয়। আমি উন্মাদিনীকে পাঠিয়ে দেব, আপনার বাড়িতে সে দাসীগিরি করবে।'

শুনে রাজার কি রাগ! 'কি! ঐ সতীলক্ষ্মীকে তুমি বাড়ি থেকে বের করে দেবে ঝি-গিরি করবার জন্যে! একথা কি করে মুখে আনতে পারলে? অমন কাজ যে করে আমি তার মুখ দেখি না।'

এই বলে রাগে মুখ লাল করে সেখান থেকে চলে গেলেন। কিন্তু দিনে দিনে তাঁর শরীর ভেঙে যেতে লাগল। শেষকালে তাঁর মৃত্যু হল।

প্রভুর মারা যাওয়ার খবর পেয়ে বলভদ্রের অবস্থা ভাবা যায় না। তাঁর স্ত্রীকে দেখার ফলেই অমন দেবতার মতো রাজার মৃত্যু হল, এ চিন্তা সইতে না পেরে শ্মশানে গিয়ে চিতা তৈরি করে বলভদ্র তাতে উঠে আগুন দিলেন। যাবার আগে খালি বললেন, 'পরজন্মেও যেন এমন প্রভু পাই।'

এই মর্মান্তিক খবর উন্মাদিনীর কানে যেতেই, সে বলল, 'তাহলে আমারই বা বেঁচে থেকে কি হবে?' এই বলে সেই চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেখতে দেখতে স্বামীর সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এই ভয়ঙ্কর গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'বল, মহারাজ—রাজা, বীরভদ্র, উন্মাদিনী, এই তিনের মধ্যে কে সবচেয়ে মহৎ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজা।' কারণ প্রভুর জন্য প্রাণ দেওয়া তো

বীরের ধর্ম আর স্বামীর চিতায় প্রাণ দেয় হাজার হাজার মেয়ে। কিন্তু রাজা তো একবার বললেই উন্মাদিনীকে দাসী করে নিয়ে আসতে পারতেন, অথচ তিনি প্রাণ দিলেন তবু তাকে সে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এ কথা শুনে বেতাল হু-শ করে আবার শ্মশানে ফিরে গেল। আর রাজাও তাকে পেড়ে এনে আবার রওনা দিলেন। বেতাল তার সপ্তদশ গল্প শুরু করল।

১৭শ গল্প

সেকালে হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্মা বলে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ছেলে গুণাকর কিন্তু বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। জুয়ো খেলে নিজের আর বাপের সব টাকাকড়ি উড়িয়ে পুড়িয়ে, শেষটা চুরি করা ধরল। বাপ তখন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

কি আর করে গুণাকর, যাযাবর হয়ে নানা দেশে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এক অচেনা শহরের কাছে এসে দেখে শ্মশানে বসে এক যোগী যোগাভ্যাস করছেন।

কি যেন মনে হল গুণাকরের, সে তাঁর কাছে গিয়ে বসে পড়ল। তার শুকনো মুখ দেখে যোগীর দয়া হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তোমার কি খাওয়া হয়নি? কি খাবে বল?' সে বলল, 'আপনি প্রসাদ দিলে তাই খাব।' যোগী তাকে একটা মরা মানুষের খুলিতে করে ভাত তরকারি দিলেন। কিন্তু সে ভাত খেতে গুণাকর রাজি হল না।

তখন যোগী চোখ বুজে যোগাসনে বসবামাত্র এক সুন্দরী যক্ষিণী হাতজোড় করে দাঁড়াল। যোগী তাকে বললেন, 'আমার এই অতিথির আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর।'

বলবামাত্র সেখানে একটা চমৎকার বাড়ি দেখা দিল। কি সুন্দর করে সাজানো সে বাড়ি। গুণাকর সেখানে পরম আরামে স্নান খাওয়া সেরে নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যক্ষিণীর আদর যত্নে কোনো খুঁত ছিল না।

কিন্তু সকালে চোখ খুলে গুণাকর দেখে কোথায় কি! সে শ্মশানে শুয়ে আছে। সন্ন্যাসী বললেন, 'এ-সমস্তই যোগবলে সম্ভব হয়েছিল। যোগবিদ্যা যে শিখবে, সে-ই এসব করতে পারবে।' গুণাকর বলল, 'আমাকে সেই বিদ্যা শিখিয়ে দিন।'

যোগী বললেন, 'বেশ। তাহলে চল্লিশ দিন ধরে মাঝরাতে, গলা অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবে থেকে. আমার দেওয়া এই মন্ত্রটি জপ করবে।'

মন্ত্রটি শিখে, চল্লিশ দিন ঐভাবে জপ করে, গুণাকর আবার যোগীর কাছে এল। যোগী বললেন, 'এবার আরো চল্লিশ দিন জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে ঐ মন্ত্র জপ করলেই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে।'

গুণাকর বলল, 'গুরুদেব, তার আগে একবার মা-বাবাকে দেখে আসি। আমি অনেকদিন ঘরছাড়া, না জানি তাঁরা কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।'

যোগীর অনুমতি নিয়ে গুণাকর বাড়ি গেল। মা-বাবা এত দিন পরে তাকে ফিরে পেয়ে আনন্দ রাখবার জায়গা পান না। তাঁদের বড় ইচ্ছে ছেলে এবার বিয়ে-থা করে। যোগীর কথা শুনে মা বললেন, 'এখন তো তোমার সংসার করার বয়স। সেও তো একটা ধর্ম। বয়স হলে যোগ-সাধনা কর বাবা। আমাদের বুড়ো বয়সে আর কষ্ট দিও না।'

গুণাকর কোনো কথাই শুনলো না। সে বলল, 'সংসার একেবারেই অসার। মা বাবা কেউ নয়, সব মায়া। আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করো না।' এই বলে মা বাবার চোখের জল উপেক্ষা করে যোগীর কাছে ফিরে গেল।

সেখানে গিয়ে যোগীর কথামতো আগুনে দাঁড়িয়ে জপ করেও কিন্তু তার সিদ্ধিলাভ হল না। এইখানে গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'কেন সিদ্ধিলাভ হল না বল।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যদি সে সত্যিসত্যি সব ত্যাগ করতে পারত, তাহলে মা-বাবাকে দেখবার জন্য অত ব্যস্ত হত না। তাঁদের কাঁদিয়ে ফিরে গিয়েও তাই তার সিদ্ধিলাভ হল না।'

এ-কথা শুনেই বেতাল আবার ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল, রাজাও তাকে নামিয়ে আবার রওনা হলেন। বেতাল অষ্টাদশ গল্প শুরু করল।

বেতাল—৫

১৮শ গল্প

সেকালে কুবলয়পুরে ধনপতি নামে একজন ধনী সদাগর ছিলেন। ধনবতী বলে তাঁর এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। বিয়ের বয়স হলে ধনপতি গৌরীদত্ত বলে একজন অবস্থাপন্ন বণিকের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। কিছুকাল পরে তাঁদের একটি রূপসী মেয়ে হল। তার নাম হল মোহিনী। মোহিনীর যখন অল্প বয়স তখন গৌরীদত্ত মারা গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন ষড়যন্ত্র করে ধনবতীর সব টাকাকড়ি কেড়ে নিল। প্রাণের ভয়ে অমাবস্যার রাতে ধনবতী তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বাপের বাড়ির দিকে চলল।

কিছুদূর গিয়ে পথ ভুল করে তারা একটা শ্মশানে পৌঁছল। সেখানে একটা চোর তিন দিন ধরে শূলে ঝুলছিলো, কিন্তু তখনো মরে নি। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে ধনবতী তার গায়ে ধাক্কা দিল। চোর কাতর স্বরে বলল, 'কেন আমার কষ্ট বাড়াচ্ছ ? আমি কি যথেষ্ট বেদনা পাচ্ছি না ?'

ধনবতীর বড় দুঃখ হল। সে বলল, 'ইচ্ছা করে ব্যথা দিইনি ভাই, অন্ধকারে দেখতে পাইনি। বল, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ?'

চোর বলল, 'চুরির জন্য আমার এই সাজা হয়েছে। কিন্তু আমার ঠিকুজিতে আছে বিয়ে না হলে আমি মরব না। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে আমি মরে শান্তি পাই। আর তোমাকে আমার ধন-সম্পত্তি দিয়ে যাই।'

ধন-সম্পত্তির কথা শুনে ধনবতীর একটু আগ্রহ হল। সে বলল, 'কিন্তু আমার যে নাতির মুখ দেখবার শখ আছে। তুমি তো এখনি স্বর্গে যাবে, তাহলে আমার নাতি দেখা হবে না।'

চোর তাতে বলল, 'সামনে ঐ গ্রামে আমার বাড়ি। ঐ বাড়ির পূব দিকে কুয়োর পাড়ের বটগাছের গোড়া খুঁড়লে আমার অনেক টাকা-কড়ি পাবে। তাই দিয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দিয়ো, নাতির মুখ দেখতে পাবে। তবে সে ছেলে কিন্তু আমার ছেলে।'

ধনবতী তখনি চোরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চোরের

প্রাণও বেরিয়ে গেল। ধনবতী তখন সেই বটগাছের গোড়া খুঁড়ে টাকা-কড়ি নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেল।

সেখানে মোহিনী বড় হতে লাগল। ক্রমে তার বিয়ের বয়স হল। তখন ধনবতী এক গরীব কিন্তু দেখতে সুন্দর একটি পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। ছেলেটির স্বভাব আসলে খুব ভালো ছিল না। কয়েক মাস পরে এক দিন রাত্রে হাতের কাছে টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি যা পেল সব নিয়ে সে সরে পড়ল।

এর কিছুদিন পরে মোহিনীর একটি অপূর্ব সুন্দর ছেলে হল। আঁতুড় ঘর যেন আলো হয়ে রইল। এর দিন আষ্টেক পরে মোহিনী স্বপ্ন দেখল যে বাঘ-ছাল পরা তিনটি চোখ, কপালে বাঁকা চাঁদ, রূপোর মতো গায়ের রং, ষাঁড়ের পিঠে বসা, দেবতার মতো এক পুরুষ তাকে বলছেন—'বাছা, কাল মাঝরাতে তোমার ছেলেকে হাজারটি সোনার মোহরের সঙ্গে সুন্দর এক প্যাটরায় ভরে, রাজার বাড়ির দোরগোড়ায় রেখে এসো। রাজা তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করবেন। তিনি স্বর্গে গেলে, ঐ ছেলে রাজা হয়ে গুণে মানে ক্ষমতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীর ঘুম ভেঙে গেল। সকালে সে মাকে স্বপ্নের কথা বলল। মাও পরদিন মাঝরাতে ছেলেটিকে ঐ ভাবে রাজার দোর-গোড়ায় রেখে এলেন।

ঠিক সেই সময় অবিকল ঐ রকম স্বপ্ন দেখে রাজাও ঘুম থেকে উঠে রানীকে ডাকলেন। দু'জনে সদর দরজা খুলে স্তম্ভিত! সত্যিই সেখানে একটি প্যাটরা পড়ে আছে। তার ডালা খুলতেই ভিতরকার ছেলেটার গায়ের আলোয় চারদিক আলো হয়ে উঠল। রানী তাকে বুকে করে ঘরে নিয়ে এলেন।

পরদিন পণ্ডিতরা গণনা করে বললেন এ যে-সে ছেলে নয়। জ্ঞানে, গুণে, রূপে, ধার্মিকতায়, প্রজাপালনে, বাহুবলে এর কোনো জুড়ি থাকবে না। এ হবে জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা।

পাঁচ মাস পূর্ণ হলে ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হল। নাম রাখা হল হরদত্ত। গরীব দুঃখীরা, ব্রাহ্মণেরা ও অন্য প্রজারা পেট ভরে ভোজ খেয়ে, টাকাকড়ি কাপড়চোপড় উপহার নিয়ে, রাজার আর তাঁর ছেলের

জয়গান করতে করতে বাড়ি গেল।

পণ্ডিতরা যা বলেছিলেন, সব ফলল। পাঁচ বছরে ছেলের হাতেখড়ি হল। তার বিদ্যাবুদ্ধি দেখে গুরুমশাইরা অবাক। এদিকে অস্ত্রচালনায়, ঘোড়ায় চড়ায়, গান বাজনায়, আর সব শাস্ত্রে দেখতে দেখতে সে দক্ষ হয়ে উঠল। লোকের মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না।

বুড়ো রাজা এক দিন স্বর্গে গেলেন। হরদত্ত রাজা হলেন। এমন বলবান, ন্যায়বান, দয়ালু আর সাহসী রাজা এর আগে কেউ দেখেনি। তিনি পৃথিবীর সব রাজার উপরে স্থান পেলেন।

তারপর একটা ভালো দিন দেখে হরদত্ত তীর্থ করতে বেরোলেন। এও সৎ রাজার একটা কর্তব্য। অন্যান্য তীর্থে ঘোরার আগে গয়ায় গিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করে, পিণ্ড দিতে বসলেন হরদত্ত।

হরদত্ত যখন ফল্গুনদীর জলে পিণ্ড নিবেদন করতে গেলেন, সেই পিণ্ড নেবার জন্য জল থেকে তিনটি ডান হাত উঠে এল। একটি সেই চোরের আর একটি সেই বণিক বরের, অন্যটি হল কুবলয়পুরের রাজার।

এই অবধি বলে, বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ, এদের মধ্যে কার পিণ্ড পাবার সবচেয়ে বেশি অধিকার ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'চোরের। সেই বণিক বর তো টাকার জন্যে মোহিনীর কাছে নিজেকে বিক্রি করেছিল। রাজাও এক হাজার সোনার মোহর পেয়ে ছেলেকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু সেই চোর ছেলের জন্যে নিজের সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিল আর তার কাছে মোহিনীর মা কথা দিয়েছিল ছেলে হবে তার।'

ঠিক উত্তর শুনে বেতাল আবার শিরীষ গাছে ঝুলে পড়ল। বিক্রমাদিত্য তাকে পেড়ে এনে যোগীর কুটিরের দিকে রওনা হলেন। বেতাল বলল, 'তাহলে উনিশ সংখ্যক গল্প শোন—'

১৯শ গল্প

সেকালে চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। এক দিন তিনি শিকারের আশায় ঘোড়ায় চড়েঃএকলা এক ঘন বনে গেলেন।

সারা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলেন, তবু হরিণ-টরিণ দেখতে পেলেন না। খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে, এক সময় এক ঋষির আশ্রমের পাশে চমৎকার এক সরোবরের ধারে পৌঁছে, ঘোড়া থেকে নামলেন।

বড় সুন্দর সে সরোবর। নীল জল টলটল করছে। তাতে রাশি রাশি সাদা লাল পদ্ম ফুল ফুটেছে। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা গাছের ডালে বসে গান গাইছে। গাছ ভরা ফুল ফল। সুগন্ধে চারদিক মো মো করছে। রাজা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন।

এমন সময় এক অপূর্ব সুন্দরী ঋষিকন্যা আশ্রম থেকে বেরিয়ে সরোবরে স্নান করতে নামল। রাজা তার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। ঠিক সেই সময়ে ঋষিও বন থেকে ফুল-ফল দূর্বা নিয়ে ফিরে এলেন।

রাজা তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই, ঋষি বললেন, 'তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

রাজা হাত জোড় করে বললেন, 'তাহলে তো আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হয়।'

ঋষির খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মুখ দিয়ে যখন কথাটা বেরিয়েছে, তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করে রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। রাজাও স্ত্রীকে নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হলেন।

পথে রাত হয়ে গেল। তাঁরা গাছতলায় শুয়ে রইলেন। অনেক রাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে ঠেলে তুলে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। তোমার বৌয়ের নরম মাংস খাব।'

রাজা বললেন, 'সে আমি সইতে পারব না। তার বদলে যা চাইবে, তাই দেব।'

রাক্ষস বলল, 'বেশ, তাহলে আমাকে একটা বারো বছরের বামুনের ছেলের মুণ্ডু কেটে খাইও।'

রাজা তখুনি রাজি হয়ে গেলেন। 'তুমি সাত দিন পরে আমার রাজধানীতে এসো, মুণ্ডু পাবে।'

রাজধানীতে ফিরেই রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'এই রকম ব্যাপার. যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।'

মন্ত্রী বললেন, 'এ আর শক্ত কি।' 'এই বলে স্যাকরা দিয়ে একটা

মানুষের সমান বড় সোনার পুতুল তৈরি করে তাকে হীরে মতির গয়না পরিয়ে, শহরের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, যে বলির জন্যে একটি বারো বছরের বামুনের ছেলেকে দান করবে, সে এই সোনার পুতুল পাবে।

শহরে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। তার বারো বছরের একটি ছেলেও ছিল। ঘোষণা শুনে সে তার স্ত্রীকে বলল, 'ছেলেটাকে দিয়ে আসি, কি বল ? ঐ সোনার পুতুল বেচে সারা জীবন আমরা সুখে থাকব। আরো কত ছেলে হবে।' স্ত্রীও রাজী হয়ে গেল।

মন্ত্রী ছেলেটিকে নিয়ে যথা সময়ে রাজার কাছে গেলেন। রাক্ষসও এসে উপস্থিত। বলি দেবার সময় রাজা খড়্গ তুলে নিতেই ছেলেটি একবার হেসেছিল। তারপর তার মাথাটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই বীভৎস গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'ছেলেটি কেন হেসেছিল, মহারাজ ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তা হাসবে না ? বাপ-মা হলেন প্রাণদাতা। এর বাপ-মা টাকার জন্য ছেলের প্রাণ দিতে রাজি। রাজা হলেন রক্ষাকর্তা। এ রাজা কোথায় রক্ষা করবেন, না নিজের হাতে গর্দান নিলেন। হাসবে না তো কি করবে ?'

অমনি বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে রইল। রাজা তাকে নামিয়ে আবার হাঁটা দিলেন। বেতাল তার বিংশ গল্প শুরু করল।

২০তম গল্প

সেকালে বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে একজন ধনী সদাগর ছিলেন। তাঁর মেয়ের নাম মদনমঞ্জরী। সে ঐ শহরের এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে বড়ই ভালোবাসত। তার নাম কমলাকর। সেও মদনমঞ্জরীকে ভালোবাসত। দুঃখের বিষয় অর্থদত্ত মদনদাস বণিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর মদনমঞ্জরী শ্বশুরবাড়ি গেল। সেখানে সে সকলের সেবা-যত্ন করে অনেক প্রশংসা পেল। তারপর মদনদাস বাণিজ্যে গেল, অনেক দিন পরে ফেরার কথা। যাবার আগে মদনমঞ্জরীকে সে বাপের বাড়ি

রেখে গেল। কমলাকরের সঙ্গে বিয়ে হল না বলে মদনমঞ্জরীর মনে বড় দুঃখ ছিল। দিনে দিনে সে শুকিয়ে যেতে লাগল।

একদিন জানলা দিয়ে কমলাকরকে সে দেখতে পেল। সে রূপবান কমলাকর আর নেই। মদনমঞ্জরীকে হারিয়ে মনের দুঃখে তার সর্বাঙ্গ যেন কালিমাখা। তাই দেখে মদনমঞ্জরীর শোক উথলে উঠল।

তার প্রিয় সখী ভাবল একবার কমলাকর এসে যদি দুটো সান্ত্বনার কথা বলে, তাহলে মদনমঞ্জরী বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এই মনে করে মদনমঞ্জরীকে রেখে সে ছুটে গেল কমলাকরের কাছে। মদনমঞ্জরীর অবস্থার কথা শুনে, কমলাকরও দৌড়ে এসে দেখল, হা সর্বনাশ, এর মধ্যে মদনমঞ্জরীর শেষ নিশ্বাস পড়েছে। শোকে পাগলের মতো হয়ে কমলাকর সেই যে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর তার জ্ঞান হল না।

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। দুজনকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে, শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বড় একটা চিতা সাজিয়ে তাতে দুজনকে দাহ করার ব্যবস্থা হল।

দাউ-দাউ করে যখন আগুন জ্বলে উঠেছে তখন উঠি-পড়ি করে, মদনদাসও সেখানে পৌঁছল। বেচারি সেদিনই বাণিজ্য থেকে ফিরেছে। স্ত্রীর জন্য কত সুন্দর কাপড়, গহনা এনেছে। একবারটি তাকিয়ে দেখে, মদনদাস সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'এদের তিনজনের মধ্যে কার ভালোবাসা সব চেয়ে বেশি ছিল?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মদনদাসের। অন্যরা দু'জন পরস্পরকে ভালোবাসত, তাই মনের দুঃখে মারা গেল। কিন্তু মদনদাস স্ত্রীকে এতই ভালোবাসত যে স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না জেনেও তার জন্যে প্রাণ দিল।'

তখন বেতাল আবার শ্মশানের গাছে ঝুলল। রাজা আবার তাঁকে নামিয়ে রওনা দিলেন। বেতালও একুশ সংখ্যক গল্প আরম্ভ করল।

২১তম গল্প

সেকালে জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ থাকতেন। তাঁর চার ছেলে। বড়টি জুয়াড়ী, মেজ দুশ্চরিত্র, সেজ বেহায়া, ছোট নাস্তিক।

শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ তাদের ব্যবহার দেখে মহা বিরক্ত হয়ে চার ছেলেকে ডেকে বললেন, যে ছেলে জুয়া খেলে দিন কাটায়, সে দেখতে দেখতে দেউলে হয়ে, নিদারুণ অভাবে কষ্ট পায়। তার ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তি থাকে না, যেমন রাজা যুধিষ্ঠিরের পর্যন্ত হয়েছিল। এমন ছেলেকে নাক-কান কেটে, গাধায় চড়িয়ে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

যে ছেলের স্বভাব মন্দ সে সুখের বদলে নিদারুণ দুঃখ পায়। আমোদ-প্রমোদ করে সেও সর্বস্বান্ত হয়ে, শেষে চুরি বিদ্যা ধরে।

বেহায়া ছেলে কোনো ভালো কথা শোনে না, মান-অপমান জ্ঞান নেই, কাজেই তাকে কিছু বলাই বৃথা। ঘোর পাপ কাজ করেও তার অনুতাপ হয় না। এমন ছেলে মরাই ভালো।

যে ছেলে ভগবানে বিশ্বাস করে না, শাস্ত্র বা সাধুজনে যার শ্রদ্ধা নেই, পরকালের যার ভয় নেই, তার সঙ্গে কথা বললেও পাপ হয়। লোকে ছেলের মঙ্গলের জন্য দানধ্যান করে, আমি তাদের মৃত্যু কামনা করি।'

এমন কঠিন কথা শুনে ছেলেদের মনে আঘাত লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল - ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখিনি বলেই আজ আমাদের এই দশা। এখন বিদেশে গিয়ে বিদ্যালাভ করে আসা যাক।

এই মনে করে তারা নানা দেশে ঘুরে, নানা রকম বিদ্যা শিখে, দেশে ফিরে এল। মাঝপথে এক ঘন বন। সেই বনে ওরা দেখল চামার একটা মরা বাঘের ছাল ছাড়িয়ে নিল, মাংসও কেটে নিল। তার পর হাড়-গোড়গুলো ফেলে রেখে চলে গেল।

এক ছেলে হাড় জোড়া দেবার বিদ্যা শিখেছিল। সে বাঘের ছড়ানো হাড়গুলো এক জায়গায় এনে, বিদ্যাবলে জোড়া দিয়ে, আস্ত একটা কঙ্কাল তৈরি করল। আরেক ছেলে মাংস গজানোর মন্ত্র শিখেছিল। সে

ঐ হাড়ের উপর মাংস গজিয়ে দিল। তৃতীয় ছেলে চামড়া লাগাবার মন্ত্র শিখেছিল, সে ঐ মাংসের উপর চমৎকার বাঘ ছাল বানিয়ে দিল। চতুর্থ ছেলে মৃত-সঞ্জীবনী, অর্ধ মরা প্রাণী জ্যান্ত করার মন্ত্র শিখেছিল। সে ঐ বাঘের শরীরে প্রাণ দিল।

বাঘটাও অমনি হালুম বলে লাফিয়ে উঠে চারজনকেই খেয়ে ফেলল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'মহারাজ, চার ছেলের মধ্যে কে সব-চেয়ে বোকা বল।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যে বাঘের শরীরে প্রাণ দিয়েছিল সেই সব চেয়ে বোকা।'

বেতাল এ কথা শুনেই শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল। রাজা তাকে নামিয়ে আবার রওনা হলেন। বেতাল তার বাইশ সংখ্যক গল্প আরম্ভ করল।

২২তম গল্প

সেকালে বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ বলে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, বুড়ি স্ত্রী ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনী দিয়ে ভরা সংসার। তবু তার বিষয় ভোগের ইচ্ছা গেল না। তিনি ভাবলেন, 'এ ভাবে থাকলে তো দুদিন বাদেই মরতে হবে। তার চেয়ে যদি যোগবলে এ শরীর ছেড়ে যুবকের শরীরে ঢুকতে পারি, তাহলে আরো অনেক দিন, নানা রকম সুখ ভোগ করতে পারব। সে বিদ্যা আমার জানা আছে। কিন্তু তাহলে আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার কি মনে করবে।

এই ভেবে, তিনি তাদের সকলকে ডেকে বললেন, 'অনেক দিন সাং-সারিক সুখ ভোগ করছি, পরকালের কথা ভাবিনি। এখন বনে গিয়ে বাকি জীবনটা ভগবানের চিন্তায় কাটাতে চাই। তোমরা মিলেমিশে থেকো।'

এই বলে ওদের কাছে বিদায় নিয়ে বনে গিয়ে ব্রাহ্মণ তাঁর বুড়ো শরীর ছেড়ে, যুবকের দেহ ধরলেন। কিন্তু শরীর ছাড়ার সময় প্রথমে কাঁদলেন, তারপর হাসলেন।

'বল মহারাজ, কেন ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'কাঁদল, কারণ পুরনো শরীরের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীর জন্য পুরনো ভালোবাসাগুলোও ছাড়তে হল। হাসল, কারণ, তার পরেই মনে হল এবার নতুন সতেজ শরীর পেয়ে অনেকদিন ফুর্তি করা যাবে।'

উত্তর শুনে বেতাল আবার গাছে ঝুলল, রাজা আবার তাকে নামিয়ে রওনা দিলেন। বেতাল তেইশ সংখ্যক গল্প শুরু করল।

২৩তম গল্প

সেকালে ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে হল ভোজন-বিলাসী, অর্থাৎ খাবারের জিনিসে এতটুকু দোষ থাকলে সে তখুনি ধরে দিত, যদিও কেউ কিছুই টের পেত না। ছোট ছেলে শয্যাবিলাসী, অর্থাৎ বিছানাপত্রে এতটুকু খুঁৎ থাকলে তাকে ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না, যদিও আর কেউ কিছু বুঝতে পারত না।

এই দুই ছেলের খ্যাতি রাজার কান অবধি পৌঁছল। রাজা তাদের গুণ পরীক্ষা করবার জন্য দুজনকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে পৌঁছলে রাজার পাকশালার বড় বামুন ঠাকুর রাজার হুকুমমতো নানা রকম চমৎকার খাবার রান্না করে, সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে অতিথিদের আদর করে ডেকে খেতে বসাল।

ভোজনবিলাসী আসনে বসেই উঠে পড়ে রাজার কাছে হাজির হল। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি হল ? খেলে না ?' সে বলল, 'খাব কি মহারাজ! ভাতে মড়ার গন্ধ। ও ধানক্ষেত নিশ্চয় শ্মশানের কাছাকাছি হবে।'

রাজা তখন ভাণ্ডারীর কাছে আসল ব্যাপার না বলে হুকুম দিলেন, 'ঐ চাল কোন ক্ষেতের ধানে তৈরি জেনে এসে আমাকে বল।' কিছুক্ষণ বাদে ভাণ্ডারী এসে বলল, 'মহারাজ, শ্মশানের কিছু দূরে যে বড় ধান ক্ষেতটা আছে, এ সেখানকার ধানে তৈরি।' রাজা তাজ্জব বনে গেলেন।

তারপর শোয়ার পালা। চমৎকার শোবার ঘরে তেরোটি পুরু তোশ-

কের উপর দুধের ফেনার মতো সাদা বিছানা পাতা হল। শয্যাবিলাসী তাতে শুয়ে, কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে উঠে পড়ে রাজার কাছে হাজির হল। কি ব্যাপার ? 'মনে হচ্ছে সাত পুরু তোশকের নিচে একটা চুল পড়ে আছে, তাতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে।'

কৌতূহলের চোটে সভাসুদ্ধ সবাই উঠে এসে বিছানা তুলে দেখে বাস্তবিকই সাতটা তোশকের নিচে এক আঙুল লম্বা একটা চুল।

রাজা দুই ভাইয়ের গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের অনেক টাকাকড়ি, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র পুরস্কার দিয়ে, রথে করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এবার বল, মহারাজ, কে বেশি গুণী ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শয্যাবিলাসী।'

বেতাল অমনি আবার শিরীষ গাছে ঝুলল—রাজা তাকে নামিয়ে হাঁটা দিলেন। বেতাল চব্বিশ সংখ্যক গল্প ধরল।

২৪তম গল্প

সেকালে কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক মহাপণ্ডিত ও ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অনেক দেবতার পূজো করে একটি ছেলে পেয়েছিলেন। সে যেমন গুণী, তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। মা বাপের সেবায় তার দিন কাটত। দুঃখের বিষয় আঠারো বছর বয়সে ছেলেটি মারা গেল।

আত্মীয়-স্বজনরা কাঁদতে কাঁদতে তার মৃতদেহ দাহ করবার জন্য শ্মশানে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন অতি বৃদ্ধ যোগী থাকতেন। যোগী ভাবলেন, 'আমি যদি এই যুবকের শরীরে যোগবলে ঢুকি, তাহলে আরো বহুকাল যোগ সাধনা করতে পারব।'

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। যুবককে চোখ মেলে উঠে বসতে দেখে, আত্মীয়রা আনন্দিত হয়ে উঠলেন। যজ্ঞশর্মাও প্রথমে হাসলেন, তার পরেই কেঁদে ফেললেন।

'বল মহারাজ, কেন ?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ছেলেকে বেঁচে উঠতে দেখে হেসেছিলেন। কিন্তু তার পরেই নিজের বিদ্যাবলে জানতে পেরেছিলেন ছেলে বেঁচে

ওঠেনি, অন্য আত্মা তার শরীরে আশ্রয় নিয়েছে, তাই কেঁদে ফেললেন।'

ঠিক উত্তর শুনে বেতাল গিয়ে গাছে ঝুলল। রাজা তাকে পেড়ে আবার রওনা হলেন। বেতাল তার পঁচিশ সংখ্যক গল্প আরম্ভ করল।

২৫তম গল্প

সেকালে দাক্ষিণাত্যের ধর্মপুর গ্রামে মহাবল নামে এক ধর্মপরায়ণ আর ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি বড় যত্ন করে প্রজাপালন করতেন। দুঃখের বিষয় তাঁর এক শত্রু রাজ্য লক্ষ লক্ষ সৈনিক, হাতি-ঘোড়া-রথ এনে এক সময় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে, রাজধানী ঘেরাও করে ফেললেন।

মহাবল তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করলেও, তাঁর লোকবল আর অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল। ফলে গোড়ায় কিছু সুবিধা করতে পারলেও, শেষ পর্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে গোপন পথে রাজধানী ছেড়ে এক ঘন বনে আশ্রয় নিতে হল।

সেই বনে অনেক ঘুরে ঘুরেও কোনো থাকবার জায়গা পেলেন না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। খিদে-তেষ্টায় রানী আর রাজকুমারী আর এক পাও চলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত আর উপায় না দেখে, তাঁদের একটা গাছতলায় বসিয়ে রেখে রাজা সাহায্যের চেষ্টায় বেরোলেন।

সেই যে বেরোলেন, রাজা আর ফিরলেন না। হয়তো কোনো সাংঘাতিক বিপদে পড়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। ভয়ে ভাবনায় মা-মেয়ের অবস্থা ভাবা যায় না। কিছুক্ষণ পাগলের মতো এদিক ওদিক ঘুরে তাঁরা গাছতলায় বসে পড়লেন।

এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। কুণ্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন আর যুবরাজ শিকার করে ফিরছিলেন। তখনো দিনের আলো একটু বাকি ছিল। সেই আলোতে বনের মধ্যে তাঁরা মানুষের পায়ের দাগ দেখতে পেলেন। ছোট ছোট পায়ের দাগ। মনে হল একাধিক মেয়ে প্রাণের ভয়ে এদিক ওদিক ঘুরেছেন।

চন্দ্রসেন যেমন বীর, তেমনি দয়ালু। যুবরাজও তার বাপেরই মতো।

ঘন বনে নিশ্চয় কোনো মেয়ে বিপদে পড়েছে, এই মনে করে দুজনে চার দিকে খুঁজে দেখতে লাগলেন। তখন রাত হয়ে এসেছে, গাছের নিচে রানী আর রাজকুমারীকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলেন।

মা-মেয়ের মনের অবস্থা ভাষায় বোঝানো যায় না। রাজা আর যুব-রাজ অনেকক্ষণ ধরে মহাবলকে খুঁজেও যখন পেলেন না, তখন এই ঘোর বনে আর রাত করা উচিত হবে না মনে করে, রানীকে আর রাজ-কুমারীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

সেখানে সেবা, যত্ন সহানুভূতি পেয়ে ক্রমে ক্রমে মা-মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন। আরো কিছুদিন পরে তাঁদের মনের দুঃখ অনেকটা কমলে, রাজা চন্দ্রসেন বিয়ে করলেন রাজকুমারীকে, যুবরাজ বিয়ে করলেন রানীকে।

এইখানে গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'এবার বল দেখি মহারাজ, এদের যখন ছেলেপুলে হবে, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি হবে?'

এইবার বিক্রমাদিত্য কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মুচকি হাস-লেন। গোড়ায় যেমন কথা হয়েছিল তাতে উত্তর দিতে না পারলে, রাজার মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু তাঁর ধৈর্য, সুবুদ্ধি আর সাহস দেখে তত-ক্ষণে বেতাল একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজার কোনো অনিষ্ট না করে, সে বলল, 'মহারাজ, তোমার উপর আমি খুশি হয়েছি, তাই কিছু উপদেশ দেব। মন দিয়ে শোন।' তারপর বেতাল তার উপদেশ শুরু করল।

শেষ কথা

বেতাল বলল, 'মহারাজ, যক্ষ তোমাকে অনেকদিন আগেই তেলী রাজা চন্দ্রভানু আর কুমার যোগী শান্তশীলের কথা বলেছিল। এই যোগীই শান্তশীল আর এই যে মড়া নিয়ে তুমি যার কাছে যাচ্ছ, এ হল চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। শান্তশীল একে মেরে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে আর আমি এর আশ্রয়ে আছি। তোমার উপর শান্তশীলের ভারী হিংসে, তোমাকেও সে মারবার তালে আছে, তা মুখে যত ভাল কথাই বলুক।

তোমাকে তাই সাবধান করে দিচ্ছি, এই মড়া দিয়ে পূজো শেষ করে যোগী তোমাকে বলবে—দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। তারপর তুমি যেই উপুড় হয়ে দেবীর সামনে শুয়ে প্রণাম করতে যাবে, তখনি সে বলির খড়্গ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে। কাজেই ও-কথা শুনে তুমি বলবে—"আমি রাজা, আমি কাউকেও কখনো প্রণাম করিনি। আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন।" তারপর তোমাকে দেখাবার জন্য যেই না যোগী উপুড় হয়ে শোবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওর মাথা কেটে ফেলবে। ওর আর চন্দ্রভানুর মৃতদেহ দুটোকে নিয়ে যক্ষের কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে ফেলে দেবে। অমনি তার সমস্ত যোগফল তোমার হবে। তুমি বহুকাল নিরাপদে মহাপ্রতাপশালী হয়ে রাজত্ব করবে। ঐ যোগী একটা খুনে, ওকে মারলে তোমার পাপ হবে না।'

এই বলে বেতাল সেই মৃতদেহ ছেড়ে চলে গেল। রাজা মড়া নিয়ে যোগীকে দিলেন। যোগী মড়ায় প্রাণ দিয়ে, তাকে বলি দিল। তারপর রাজাকে বলল, 'দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।' এর পর সব ঘটনা বেতালের কথা মতো ঘটল। যোগীর গলা কাটতেই দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ইন্দ্র দেখা দিয়ে বর দিতে চাইলে, বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মহারাজ আমি বর নিয়ে কি করব, আপনাদের দয়ায় আমি সব পেয়েছি। শুধু এই আশীর্বাদ করুন এইসব আশ্চর্য ব্যাপার যেন পৃথিবীর লোকে কখনো না ভোলে।'

ইন্দ্র তাই হবে বলে স্বর্গে গেলেন।

বিক্রমাদিত্য তখন বেতালের কথা মতো মৃতদেহ দুটিকে তেলের কড়াইতে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই বিকট বীরপুরুষ দেখা দিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমরা তাল-বেতাল। আপনি যখন যা বলবেন তাই করব।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বেশ, এখন যাও! দরকার হলেই তোমাকে ডাকব।'

তারপর খুশিমনে রাজধানীতে ফিরে এসে, বহু বছর ধরে বিক্রমাদিত্য আদর্শ রাজার মতো দেশ শাসন আর প্রজা পালন করেছিলেন।

বত্রিশ সিংহাসন

এক

তাল-বেতালকে পেয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের ক্ষমতা আরো প্রবল হয়ে উঠল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা বলে সকলেই তাঁকে মেনে নিল। আর শুধু পৃথিবীর কেন, স্বর্গের দেবতারাও তাঁকে কম শ্রদ্ধা করতেন না। সময় সময় তাঁদের সাহায্য করবার জন্যেও বিক্রমাদিত্যের ডাক পড়ত।

একবার নানা কারণে বিশ্বামিত্র মুনি কঠোর তপস্যা শুরু করেছিলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না যে মুনির তপস্যা সফল হয়। কাজেই তিনি স্থির করলেন যে অপ্সরাদের কাউকে পাঠিয়ে, নাচ-গান দিয়ে মুনির তপস্যা ভাঙাতে হবে। এখন কথা হল কাকে পাঠাবেন। অপ্সরাদের সেরা বলতে দুজন—রম্ভা আর উর্বশী। এদের মধ্যে যে বেশি দক্ষ আর অভিজ্ঞ, তাকেই পাঠাতে হবে। কিন্তু দুজনেই ওস্তাদিতে সমান, তাদের মধ্যে বিচার করা বড় শক্ত! ইন্দ্র কি করবেন ভেবে পেলেন না।

এমন সময় নারদ বললেন, 'এ আর এমন কি সমস্যা। উজ্জয়িনী থেকে রাজা বিক্রমাদিত্যকে ডেকে পাঠান। তাঁর মতো সব বিদ্যায় আর চৌষট্টি কলায় বিশারদ ত্রিভুবনে কেউ নেই।'

ইন্দ্র তখন তাঁর সারথি মাতলিকে বিক্রমাদিত্যের কাছে পাঠালেন। বিক্রমাদিত্য তখনি তার সঙ্গে এলেন। চমৎকার করে সভা সাজানো হল। সেখানে প্রথম দিন রম্ভা আর পরের দিন উর্বশী নাচ দেখাল। এমন নিখুঁত নাচ কেউ দেখেনি। দুজনেই শাস্ত্রের সব নিয়ম মেনে নেচেছিল, তবু ওরই মধ্যে উর্বশীকে বিজয়িনীর সম্মান দিলেন বিক্রমাদিত্য। শ্রেষ্ঠত্বের যত রকম লক্ষণ নৃত্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, উর্বশীর নাচে তার সবই দেখা গিয়েছিল।

সে যাই হোক, ইন্দ্রের সমস্যার সমাধান হল। তিনি আনন্দিত হয়ে বিক্রমাদিত্যকে চমৎকার কাপড়চোপড় আর অপূর্ব এক রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। এ রকম সিংহাসন কেউ কল্পনা করতে পারে না।

মণি-মাণিক্য বসানো বত্রিশটি অপরূপ পুতুলের মাথায় পা রেখে, সেই সিংহাসনে বসতে হয়।

সেই অদ্বিতীয় সিংহাসন নিয়ে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে ফিরে

গেলেন। সেখানে গিয়ে, শুভলগ্নে দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে ঐ সিংহাসনে বসলেন। তারপর বহু বছর ধরে ঐ সিংহাসনেই বসে ধর্মপরায়ণ রাজা প্রজাপালন আর রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

তারপর এক বছর উজ্জয়িনীতে নানা রকম অমঙ্গল লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। ভূমিকম্প, ধূমকেতু, দাবানল। পণ্ডিতরা বলতে লাগলেন এ-সবের মানে রাজার দুঃসময় এসেছে।

রাজা তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন, 'কেন মিছিমিছি আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন? আমি একবার কঠোর তপস্যা করে দেবতার বর পেয়েছিলাম। দেবতা আমাকে অমর করে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বলেছিলাম, "আমাকে এই বর দাও যে যখন কোনো আড়াই বছরের মেয়ের ছেলে হবে, তার হাতেই যেন আমি মরি। আর কোনো ভাবে নয়।" বুঝতেই পারছেন যে তা হবার নয়, কাজেই আমিও নিরাপদে আছি।'

পণ্ডিতরা তবু নিশ্চিত হতে পারলেন না দেখে, রাজা বেতালকে ডেকে বললেন, 'তুমি সমস্ত পৃথিবী খুঁজে দেখ, ঐ রকম কোনো ছেলে জন্মেছে কিনা।'

বেতাল ঘুরতে ঘুরতে এক সময় জম্বুদ্বীপের প্রতিষ্ঠানগরে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেল। ব্রাহ্মণের ছোট মেয়ে তার চেয়ে অল্প ছোট একটি ছেলের সঙ্গে খেলা করছে। ব্রাহ্মণ বললেন মেয়েটি তাঁর কন্যা আর ছেলেটি ঐ মেয়ের ছেলে, শালিবাহন। মেয়ের যখন আড়াই বছর বয়স তখন সে জন্মেছিল। ওর বাবা হলেন শেষ-নাগ।

এ-কথা শুনেই বেতাল উজ্জয়িনী ফিরে গিয়ে বিক্রমাদিত্যকে সব কথা বলল। তাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে, তলোয়ার হাতে বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠাপুরের দিকে চললেন। সেখানে পৌঁছে, শালিবাহনকে দেখেই তলোয়ার নিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের হাতে একটা লাঠি ছিল। সে তাই দিয়েই বিক্রমাদিত্যকে মোক্ষম এক বাড়ি দিল। শেষনাগের ছেলের সেই বাড়ির চোটে বিক্রমাদিত্য ছিট্‌কে একেবারে উজ্জয়িনীতে এসে পড়লেন। তখন তাঁর মরণদশা। দেখতে দেখতে তাঁর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হল। বিক্রমাদিত্য স্বর্গে গেলেন।

পৃথিবীময় হাহাকার উঠল। উজ্জয়িনীর শোকার্ত লোকদের কথা ভাবা যায় না। একটি ছেলে পর্যন্ত রেখে যাননি বিক্রমাদিত্য। তবে জানা গেল যে তাঁর এক রানীর মাস দুই পরেই সন্তান্ত হবে। কি আর করেন মন্ত্রীরা, কবে সেই ছেলে জন্মাবে সেই আশায় রাজার প্রতিনিধি হয়ে, তাঁরা রাজকার্য চালাতে লাগলেন। সিংহাসন খালি পড়ে রইল।

একদিন সভার মধ্যে দৈববাণী শোনা গেল, 'এই পবিত্র সিংহাসনে বসবার যোগ্য পৃথিবীতে কেউ নেই। কাজেই এই সিংহাসন কোনো ভালো জায়গায় রেখে দেওয়া হোক।'

তাই করা হল। একটা পবিত্র জায়গায় সিংহাসন রেখে দেওয়া হল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল, সিংহাসনের উপর ধুলোমাটির স্তর জমতে লাগল। আরো পরে সিংহাসনটি মাটির নিচে একেবারে চাপা পড়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে লোকে তার কথা ভুলে গেল। ঐ জায়গায় চাষবাস হতে লাগল।

দুই

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর অনেক বছর কেটে গেল। উজ্জয়িনীতে তখন ভোজরাজ রাজত্ব করছিলেন। সিংহাসনের কথা তিনি কিছুই জানতেন না। যেখানে সিংহাসন রাখা হয়েছিল, সেখানে তখন বড় শস্যক্ষেত। ক্ষেতের মালিক একজন ব্রাহ্মণ।

পাখিতে বড় শস্যের ক্ষতি করত। ক্ষেতের মাঝখানে একটা উঁচু ঢিবি। ব্রাহ্মণ তার উপর মাচা বেঁধে পাখি তাড়ায়। একদিন ভোজরাজ লোকজন নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে ঐ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢিবির উপর থেকে ব্রাহ্মণ তাদের দেখতে পেয়ে ডেকে বলল, 'চলে যাচ্ছেন কেন? আমার ক্ষেতে এত ফল, তরকারি, যব, কাঁকুড় হয়েছে যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না। আপনারাও খান, ঘোড়াগুলোও খাক। দেখে আমিও খুশি হই।'

রাজাও লোকজন নিয়ে ক্ষেতে নেমেছেন আর তাঁদের অভ্যর্থনা

করবার জন্য ব্রাহ্মণও নিচে নেমে এসেছে। নেমে এসেই কিন্তু সে উল্টো কথা বলতে আরম্ভ করল, 'এ কি রকম ব্যবহার, মহারাজ? অবিশ্যি আপনি রাজা, যা খুশি করতে পারেন। তাই বলে গরীব প্রজার ফসল নিজেরা খেয়ে সন্তুষ্ট নন, আবার ঘোড়া দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছেন। এই কি রাজার কাজ হল?'

লজ্জা পেয়ে ভোজরাজ লোকজনদের ডেকে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণও ততক্ষণে আবার মাচার উপর গিয়ে চড়েছে। চড়েই অন্য মানুষ হয়ে গেছে। চোখে জল, দু হাত জোড় করে আবার বলছে, 'মহারাজ, গরীবের নিমন্ত্রণ অবহেলা করে চলে যাবেন না। চেয়ে দেখুন আমার দরকারের চেয়ে কত বেশি রয়েছে। পাঁচজনে ভাগ করে খেলে আমি কৃতার্থ হই!'

রাজা তো অবাক! 'এ আবার কি! মাচায় উঠলেই এমন সজ্জন আর নিচে নামলেই অন্য মানুষ! কি আছে ঐ ঢিবিতে যে মানুষটাকে অমন উদার দাতা করে দেয় আর নেমে এলেই তার মন ছোট হয়ে যায়? দেখি তো একবার ওর উপরে চড়ে!' এই ভেবে রাজা ঘোড়া থেকে নেমে ঢিবির উপরে উঠলেন। উঠেই তাঁর মনে হল—পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে, আমি কি করে সুখী হই? আমার কর্তব্য সব লোকের অভাব দূর করা, তাদের সুখী করা। আমি রাজা, দুষ্টকে শাসন করা, ভালো লোককে পালন করা, দরকার হলে প্রাণ দিয়ে প্রজাদের রক্ষা করা।' তাঁর সমস্ত মন কি এক অপূর্ব আনন্দে ভরে গেল।

ভোজরাজ বুঝতে পারলেন এ যে-সে জায়গা নয়। এখানকার মাটি বড় পবিত্র, মানুষের মনে মহৎ ভাব জাগায়। ঠিক করলেন এর গোপন রহস্যটি কি, তা জানতে হবে। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ক্ষেত থেকে তোমার কত লাভ হয়?' ব্রাহ্মণ বলল, 'এর জন্য আপনি যা কিছু ন্যায্য বলে মনে করবেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব। আপনার মতো সুবিচার আর কে করতে পারে?'

ভোজরাজ তখন জমির জন্য উপযুক্ত দাম আর তার উপরে যথেষ্ট উপহার দিয়ে জায়গাটি নিলেন। তারপর লোকজন লাগিয়ে মাচার গোড়া থেকে খোঁড়া শুরু করলেন। এক মানুষ গভীর গর্ত হতেই

চমৎকার একটা পাথর দেখা গেল। আর তারই নিচে চন্দ্রকান্ত মণি দিয়ে তৈরি অপরূপ এক সিংহাসন। তার আগাগোড়া নানান মণি বসানো। পা রাখার জায়গায় বত্রিশটি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি।

সিংহাসন দেখে ভোজরাজের মন স্বর্গীয় আনন্দে ভরে গেল। তিনি অনেক লোকজনের সাহায্যে সেটিকে তুলিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। সিংহাসন এক চুল নড়ল না। রাজা বুঝলেন এ বড় পবিত্র জিনিস, ওভাবে নেওয়া যাবে না।

তখন তিনি মন্ত্রীকে বললেন, 'এটাকে নড়ানো যাচ্ছে না কেন বলুন তো? এখন আমার কি করা উচিত?' মন্ত্রী বললেন, 'আগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে এখানে পূজো-অর্চনার ব্যবস্থা করুন। পূজোর পর দেবতার নাম নিয়ে, আবার চেষ্টা করতে হবে।'

রাজা তখুনি সেই ব্যবস্থা করলেন। শ্রদ্ধা ভরে পূজো হল। তারপর দেবতার নাম নিয়ে সিংহাসনে হাত দিতেই, সে হাল্কা হয়ে আপনি চলতে লাগল। সকলের মুখে ধন্য-ধন্য রব।

ভোজরাজের মনে কোনোরকম অহংকার ছিল না। তিনি মন্ত্রীকে বললেন, 'মন্ত্রী, আপনার পরামর্শের জন্যই এ কাজ সম্ভব হয়েছে। আমার নিজের বুদ্ধিতে কখনই এই অপরূপ সিংহাসনটি ওখান থেকে নড়ানো যেত না। বুদ্ধিমানের কাছাকাছি থাকাও পরম সৌভাগ্য।' মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, যিনি নিজে বুদ্ধিমান, কিন্তু অন্যের বুদ্ধিতে কান দেন না, তিনি পরে কষ্ট পান। তাছাড়া রাজার মঙ্গল করাই মন্ত্রীর কাজ। রাজা যদি কোন অন্যায় কাজ করতে যান, তাকে বাধা দেওয়াও মন্ত্রীর কর্তব্য।' সেকালে নন্দরাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিল, তাই কিভাবে ব্রহ্মহত্যা বন্ধ হয়েছিল সে গল্প শুনুন, মহারাজ।'

তিন

সেকালে বিশালা নগরীতে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড বাহুবল ও তেজ ছিল। তার জোরে তিনি সব শত্রুদের হারিয়ে, তাদের উপর প্রভুত্ব করতেন।

কিন্তু এমন রাজারও একটি বড় দুর্বলতা ছিল। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ভানুমতীকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। এমন কি

যখন তিনি সিংহাসনে বসে সভার কাজ করতেন, তখনও ভানুমতীকে পাশে নিয়ে বসতেন। সভার মাঝখানে ঘরের বৌকে বসানোর জন্যে অনেকে রাজার নিন্দা করত।

নন্দর মন্ত্রীর নাম ছিল বহুশ্রুত। তাঁর যেমন বুদ্ধি, তেমনি সৎ-সাহস। উচিত কাজ করতে তিনি ভয় পেতেন না। একদিন তিনি রাজাকে বললেন, 'এটা ঠিক হচ্ছে না মহারাজ। শাস্ত্রে এটার বারণ আছে। তাছাড়া যে-সে সভায় এসে রানীকে দেখবে এটা কি ভালো?'

রাজা বললেন, 'কিন্তু আমি যে ওকে না দেখে থাকতে পারি না।' মন্ত্রী তখন পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে একজন ভালো শিল্পীকে দিয়ে রানীমার একটা ছবি আঁকিয়ে, সেই ছবিটাকে চোখের সামনে রাখলেই তো হয়।'

শিল্পীকে ডাকা হল। তিনি রানীকে একবার দেখেই তাঁর মধ্যে নানা শুভ লক্ষণ চিনতে পারলেন। হুবহু সেই রকম ছবি আঁকা হল। সে ছবি দেখে রাজা এত খুশি হলেন যে শিল্পীর বহু প্রশংসা করে, তাঁকে অনেক ধনরত্ন উপহার দিলেন। এরপর থেকে ছবিটি রাজার সিংহাসনের পাশে শোভা পেত।

একদিন রাজার গুরু শারদানন্দ এসে ছবি দেখে শিল্পীকে বললেন, 'ওহে, সব এঁকেছ, কিন্তু রানীর বাঁ পায়ে যে মাছির মতো একটা তিল আছে, তা তো দাওনি।'

বাস্তবিকই রানীর পায়ে ঐ রকম একটা তিল ছিল। কিন্তু শারদানন্দের কথা শুনে রাজা ভীষণ চটে গেলেন।

মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'রানীর পায়ে কি রকম তিল আছে শিল্পীকে গিয়ে সে-কথা বলা মানে রানীর অসম্মান করা। এমন গুরুতে আমার দরকার নেই। ওঁর প্রাণদণ্ড হোক। আপনি তার ব্যবস্থা করুন।'

কি আর করেন মন্ত্রী, রাজার ভয়ে সত্যি সত্যি শারদানন্দকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে দুষ্কৃতকারীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। শারদানন্দের মনে কোনো ভয় ছিল না। তিনি বললেন, 'মানুষ যে বিপদেই পড়ুক না কেন, তার নিজের পুণ্য তাকে সর্বদা রক্ষা করে।'

কথাটা শুনে মন্ত্রীর কেমন খটকা লাগল। তিনি দেখলেন, শারদানন্দ

অন্যায় করুন আর নাই করুন, আমি কেন ব্রহ্মহত্যার মতো পাপ করি?' এই ভেবে শারদানন্দকে মাটির তলায় একটা গোপন ঘরে লুকিয়ে রেখে রাজাকে বললেন, 'আপনার হুকুম পালন করা হয়েছে।'

এর কিছুদিন পরে রাজকুমার জয়পালের শিকারে যাবার শখ হল। কিন্তু সে সময় ভূমিকম্প, অকালবৃষ্টি, উল্কাপাত এইসব দেখা গেল। মন্ত্রীর ছেলে বুদ্ধিসাগর জয়পালের বন্ধু। তিনি তাঁকে বারবার বারণ করলেন, 'এ সব অমঙ্গল চিহ্ন দেখেও তুমি কি বলে বেরোচ্ছ?' জয়পাল বললেন, 'ও সবে আমি বিশ্বাস করি না।'

এই বলে বনে গিয়ে অনেক হিংস্র জানোয়ার মারলেন। তারপর একটা কৃষ্ণসার হরিণের পিছনে ছুটে ছুটে একেবারে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। বাইরের শব্দ সেখানে পৌঁছয় না। এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়। রাজকুমারের সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে রাজধানীতে ফিরে গেল। জয়পাল একা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে লাগলেন। একসময় একটা জলাশয় দেখে, ঘোড়া থেকে নেমে, জল খেয়ে, জলের ধারে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

এমন সময় একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখেই, বাঁধন ছিঁড়ে ঘোড়াটা রাজধানীর দিকে ছুট দিল। রাজকুমারের হাতে অস্ত্র ছিল না। প্রাণের ভয়ে তিনি একটা গাছে উঠে পড়লেন।

সে গাছে একটা ভালুকও আশ্রয় নিয়েছিল। নিচে বাঘ, উপরে ভালুক, রাজকুমারের বড় ভয় হল। কিন্তু ভালুক তাঁকে বলল, 'কোনো ভয় নেই। তুমি আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছ, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। এসো, আমার কোলে শুয়ে ঘুমোও। পড়ে গেলে বাঘে খাবে।'

জয়পাল নির্ভয়ে ভালুকের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন বাঘটা ভালুককে বলল, 'ওহে, ওটা একটা মানুষ। ও পারলেই তোমার আমার অনিষ্ট করবে। তুমি বরং ওকে নিচে ফেলে দাও, আমি খাই।'

ভালুক বলল, 'তা হোক। ও যখন আমার আশ্রিত, আমি ওকে রক্ষা করব।'

খানিক বাদে রাজকুমারের ঘুম ভাঙল। তখন ভালুক বলল, 'এবার

আমি একটু ঘুমোই, তুমি সাবধানে থেকো। নিচে কিন্তু বাঘ।'

ভালুক ঘুমোলে বাঘ বলল, 'ওহে রাজকুমার, ভালুক বড় সাংঘাতিক জানোয়ার। যাদের নখ, দাঁত বা শিং থাকে, তাদের বিশ্বাস করতে হয় না। ওকে বরং নিচে ফেলে দাও, আমি খেয়ে চলে যাই।'

বাঘের কথা শুনে রাজকুমার ঘুমন্ত ভালুককে ঠেলে নিচে ফেলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভালুক জেগে গিয়ে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল। তারপর সে এই বলে রাজকুমারকে শাপ দিল, 'তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তুমি এই বনে পিশাচের মতো ঘুরবে আর মুখে খালি বলবে সসেমিরা।' সসেমিরা মানে সংকট-অবস্থা।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে, বাঘ ভালুক যে যার পথ দেখল। আর রাজকুমার পিশাচের মতো 'সসেমিরা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বনে ঘুরতে লাগলেন। এদিকে রাজকুমারের ঘোড়াকে একা ফিরতে দেখে, প্রজারা রাজাকে জানাল।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকলেন, 'বারণ না শুনে সে গেল, এখন কি বিপদে পড়েছে কে জানে। চলুন, তাকে খুঁজতে যাই।'

বনে গিয়ে রাজকুমারকে ঐ ভাবে ঘুরতে দেখে রাজার বুক ফেটে গেল। 'হায় হায়, কিছু বিবেচনা না করেই শারদানন্দকে প্রাণদণ্ড দিলাম। এ তারই ফল। তাঁর কোনো দোষ হয়নি। আজ তিনি থাকলে, ওষুধ দিয়ে আমার জয়পালকে ভালো করে দিতেন।' ছেলেকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে, রাজা ঘোষণা করলেন, 'যে রাজকুমারকে সারিয়ে দেবে, তাকে অর্ধেক রাজ্য দেব।'

বাড়ি ফিরে মন্ত্রী শারদানন্দকে সব কথা জানালেন। গুরু বললেন, 'তুমি রাজাকে গিয়ে বল, তোমার একটি মেয়ে আছে, রাজকুমারকে তার কাছে নিয়ে এলে, সে তাঁকে সারিয়ে দেবে।'

এ-কথা শুনে লোকজন আর জয়পালকে নিয়ে রাজা মন্ত্রীর বাড়ি এলেন, জয়পালের মুখে সসেমিরা বুলি।

পরদার পিছনে বসে শারদানন্দ তাকে বললেন। 'যার কোলে শোয়া যায়, সে ঘুমোলে তাকে মারা কি পুরুষের কাজ? এ-কথা শুনে চমকে উঠে, জয়পাল শুধু সসেমিরা বলতে লাগলেন।

শারদানন্দ আবার বললেন, 'ব্রাহ্মণ মেরে রামেশ্বর কি সাগরসঙ্গমে গেলে পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু যে অনিষ্ট করে তার ক্ষমা নেই।' এ-কথা শুনে জয়পাল শুধু মিরা মিরা বলে চেঁচাতে লাগলেন।

শারদানন্দ বললেন, 'যে মানুষ বন্ধুর ক্ষতি করে, মহাপ্রলয়ের দিন অবধি তাকে নরক বাস করতে হয়।' এ-কথা শুনে জয়পাল শুধু রা রা বলতে লাগলেন। তখন শারদানন্দ রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, রাজকুমারকে যদি ভালো করতে চান, তাহলে ব্রাহ্মণদের দান করুন আর দেবতাদের আরাধনা করুন।'

এ-কথা শুনেই জয়পাল আবার সুস্থ হলেন, তাঁর বুদ্ধিসুদ্ধি ফিরে এল। তিনি রাজাকে প্রণাম করে, ভালুকের কথা খুলে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

তখন মন্দ বললেন, 'কুমারি! তুমি এত বিদ্যা কোথায় পেলে?' বলে এক টানে পরদাটা ফেলে দিলেন। পরদার আড়ালে শারদানন্দ বসে ছিলেন। রাজা, রাজকুমার আর সবাই তাঁর পায়ে পড়লেন।

তারপর রাজা মন্ত্রী বহুশ্রুতকে বললেন, 'আপনাকে কাছে পেয়েছিলাম বলেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম। সৎ সংসর্গ ই পুরুষের কর্তব্য। রাজকুমারও আপনার বুদ্ধির কারণেই সুস্থ হলেন।' এর পর রাজা বহুকাল ধরে রাজগুরুর আশীর্বাদ আর মন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে সৎ রাজার কাজ করেছিলেন। গল্প শেষ করে মন্ত্রী ভোজরাজকে আবার বললেন, 'যে রাজা মন্ত্রীর কথা শোনেন, তিনি সুখী আর দীর্ঘজীবী হন।'

তখন ভোজরাজ মন্ত্রীকে নানা উপহার দিয়ে সম্মান দেখিয়ে, সিংহাসনটিকে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

চার

এর পর ঐ সুন্দর সিংহাসনটিকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে আসতে কোনো কষ্ট হল না। সে যেন আপনি গড়গড় করে চলে এল। উজ্জয়িনীতে এক হাজার থামের উপরে অপরূপ কারুকার্য করা একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে সিংহাসন বসানো হল। হোম, আরাধনা হল। স্নান করে, উপযুক্ত ভাবে সেজেগুজে ভোজরাজ এলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

রাজাও তাঁদের আর যেমন বড়লোকদের তেমনি দুঃস্থ, গরীব, অনাথ, দুঃখী, পঙ্গু, রুগ্ন, তাঁর সব প্রজাদের প্রচুর ধনদৌলত দিয়ে সমাদর করলেন। দীপের, ধূপের, ফুলের মালার সুগন্ধে চারদিক মো-মো করতে লাগল। তারপর শুভ মুহূর্ত দেখে রাজা উঠলেন। কবিরা তাঁর বন্দনা গান করতে লাগলেন। ছত্রধর মাথার উপর রেশমের ছাতা ধরল, কিংকররা চামর দোলাতে লাগল। ভোজরাজ বিনীত মনে সিংহাসনে উঠবার জন্য প্রথম পুতুলের মাথায় পা রাখলেন।

অমনি সে পুতুল জীবন্ত হয়ে উঠে বলল, 'আমার নাম মিশ্রকেশী। মহারাজ, আপনি যে অতুল গুণের অধিকারী বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে উঠতে যাচ্ছেন, আপনার কি তাঁর মতো সাহস, বীরত্ব, উদারতা আর ধর্মজ্ঞান আছে?'

ভোজরাজ বললেন, 'নিজের প্রশংসা নিজে করলে পাপ হয়, তবু তুমি জানতে চাইলে তাই বলছি, ও-সব গুণ আমার আছে। আমার কাছে যে যা চেয়েছে আমি দরকার মতো সবই দিয়েছি।'

পুতুল বলল, 'যে সজ্জন, তাকে জিজ্ঞাসা করলেও সে নিজের প্রশংসা করে না। তেমনি সে অন্যের নিন্দাও করে না। ও-সব করে যারা দুর্জন। আরো বলি মহারাজ, নিজের প্রশংসা ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিসের কথা বুদ্ধিমান লোকে মুখে আনে না। সে হল তার আয়ু কত, ধন কত, নিজেদের বাড়িতে কি কি দোষ আছে, গুরু কি মন্ত্র দিয়েছেন, কি ওষুধ দিয়েছেন, কোথায় কি সুখ পেয়েছেন, দান-মান কাকে দিয়েছেন বা পেয়েছেন আর অপমানের কথা। এ-সব কাউকে বলতে হয় না। যাই হোক, কখনো নিজের প্রশংসা বা অন্য লোকের নিন্দা করবেন না।'

ভোজরাজের মতো নিরহংকার মানুষ কম ছিল। এতটুকু বিরক্ত না হয়ে তিনি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, মিশ্রকেশী। ও-ভাবে নিজের প্রশংসা করা আমার বোকামি হয়েছে। এবার এ সিংহাসনে যিনি এক সময় বসতেন, তাঁর উদারতার কথা আমাকে বল।'

পুতুল বলল, 'তিনি কি রকম দাতা ছিলেন বলি। যে কেউ টাকার আশায় এলে, যদি তার উপর সন্তুষ্ট হতেন তাকে এক হাজার সোনার মোহর দিতেন। আর যদি সে তাঁর সঙ্গে ভালো ভাবে কথা বলত, তাকে

এক অযুত, অর্থাৎ দশ হাজার মোহর দিতেন। মহৎ লোকদের তিনি এক লক্ষ, অর্থাৎ একশো হাজার মোহর দিতেন। আর যারা কোনো ভালো কাজ করে তাঁকে খুশি করত, তাদের দিতেন এক কোটি, অর্থাৎ একশো লক্ষ মোহর। যদি এ-রকম দান করার মন আপনারও থাকে, তাহলে আপনিও এই সিংহাসনে বসার যোগ্য।'

এই উত্তরে ভোজরাজ আর কি বলবেন? দান করবার জন্যে অত মোহরই বা কোথায় পাবেন? কাজেই তিনি চুপ করে রইলেন।

সেদিন সিংহাসনে চড়া হল না।

পাঁচ

তার পরদিন আবার স্নান করে শুদ্ধ মনে ভোজরাজ যেই দ্বিতীয় পুতুলের মাথায় পা রাখতে যাবেন, সে পুতুলও জীবন্ত হয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার নাম প্রভাবতী। বিনীত ভাবে আপনাকে বলি, যে-মানুষের মনে বিক্রমাদিত্যের মতো ধৈর্য আছে, শুধু সে-ই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য। আপনার কি সে রকম ধৈর্য আছে?'

রাজা বললেন, 'সে কি রকম ধৈর্য আমাকে বল।'

প্রভাবতী বলল, 'তাহলে একটা গল্প শুনুন। একবার রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর চরদের বললেন, "তোমরা সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে দেখ। যেখানে যত অতি আশ্চর্য বা মজার ঘটনা বা দৃশ্য চোখে পড়বে সব আমাকে এসে বলবে। আমিও গিয়ে দেখে আসব।"

চররা সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুদিন পরে একজন ফিরে এসে বললে, "মহারাজ, চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে এক তপোবন দেখলাম। তপোবনে এক সুন্দর মন্দির দেখলাম। সে জায়গা বড় পবিত্র। পাহাড়ের মাথার উপর থেকে পরিষ্কার জলের ধারা নেমে আসছে। শুনলাম সেই জলে স্নান করলে, মন থেকে সব পাপ দূর হয়। এমন কি নিজের চোখে দেখা যায় জলের সঙ্গে কালো রং ধুয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ঐ কুণ্ডের কাছে একজন ব্রাহ্মণকে দেখলাম। তিনি হোমকুণ্ডে ক্রমাগত আহুতি দিচ্ছেন। কেউ জানে না উনি কতকাল ধরে এ-কাজ করছেন। কুণ্ডের ধারে রোজ হোমের আগুনের ছাই জমে পাহাড় হয়ে থাকে। উনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এরকম আশ্চর্য ব্যাপার আমি

কোথাও দেখিনি।"

এই বর্ণনা শুনে বিক্রমাদিত্যের বড় কৌতূহল হল। তিনিও একলা সেই দুর্গম জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। চারিদিকে চেয়ে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। মনে হল এই রকম পবিত্র জায়গাতেই দেবী জগদম্বা থাকেন। এ স্থান দেখলেও পুণ্য হয়।

তারপর রাজা সেই আকাশ থেকে নেমে আসা জলের স্রোতে স্নান করে, দেবীকে প্রণাম করলেন। তারপর মনে সাহস সঞ্চয় করে ব্রাহ্মণকে গিয়ে বললেন, "আপনি কত কাল এখানে হোম করছেন?"

ব্রাহ্মণ এবার কথা বললেন, "তা একশো বছর হবে। তখন সপ্তর্ষি-মণ্ডল রেবতী নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখন তাঁরা অশ্বিনী নক্ষত্রে অধি-ষ্ঠিত। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত দেবীর দয়া লাভ করলাম না।"

তখন বিক্রমাদিত্য নিজে হোম করে কুণ্ডে আহুতি দিলেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। তখন বিক্রমাদিত্য বললেন, "দেবী! তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য আমি নিজের মাথাটি ফলের বদলে নিবেদন করব।" এই বলে খড়্গ তুলে নিলেন। সেই সময়ে দেবী তাঁর হাত ধরে ফেলে বললেন, "আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "মা, এই ব্রাহ্মণ এতকাল হোম করছেন, তাঁর দিকে তুমি ফিরে চাইলে না। অথচ আমি সবে এসেছি, আমার উপর এত কৃপা করলে কেন?"

দেবী বললেন, "বাছা, অনেক দিন হোম করলেও, ওর মনে সেরকম একাগ্রতা নেই, যার জন্য আর সব ইচ্ছা ত্যাগ করে, শুধুমাত্র এক উদ্দেশ্য নিয়ে সাধনা করা যায়। শাস্ত্রে বলে আঙুলের ডগা দিয়ে যে জপ করা হয়—সে সবই বিফল হয়। কাঠে পাথরে মাটিতে পুতুলে দেবতা বাস করে না, মনের ভাবেই তাঁর অধিষ্ঠান।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "তাহলে আমার উপরে যদি খুশি হয়ে থাক, মা, এই ব্রাহ্মণের মনের ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

দেবী বললেন, "তাই হবে। শোন, বাছা, তুমি এ জীবনে ধন্য। পরের উপকারের জন্যই মানুষ জন্মায়। পরের উপকারের জন্য গাছেরা ছায়া দেয়, ফল দেয়, কিন্তু নিজেরা সে ছায়া বা ফল ভোগ করে না।

পরের উপকারে নদী বয়ে যায়, গরু মিষ্টি দুধ দেয়। পরোপকারীদেরই জীবন সার্থক হয়।" এই বলে দেবীও অদৃশ্য হলেন, রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।'

গল্প শেষ করে প্রভাবতী বলল, 'এই রকম ধৈর্য আর একাগ্রতা যদি আপনার থাকে, তা হলে সিংহাসনে বসুন।'

রাজা মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন। সে দিনও সিংহাসনে চড়া হল না!

ছয়

তার পরদিন ভোজরাজ আবার যখন সিংহাসনে উঠতে গেলেন, তখন আর একটি পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম সুপ্রভা। আপনি কি রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো আপন-পর ভেদ ত্যাগ করেছেন? সে গুণ আছে আপনার?'

ভোজরাজ বললেন, 'কেমন সে গুণ বল। সুপ্রভা বলল, 'বিক্রমাদিত্যের একদিন মনে হল এই সংসার একেবারে অসার। মানুষ আজ আছে, কাল নেই। ধনরত্নের তিন রকম পরিণাম, তাকে দান করা যায়, তাকে ভোগ করা যায় আর তাকে নষ্ট করা যায়। সম্পত্তি থাকলে, তাকে পুঁজি করে না রেখে, হয় ভোগ করতে হয়, নয় তার চেয়েও বড় কথা—দান করতে হয়।

এই সব কথা মনে হবার ফলে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞ করলেন। শিল্পীরা চমৎকার মণ্ডপ সাজালেন। যজ্ঞের সব রকম সামগ্রী আনা হল। দেবতা, মুনি, যক্ষ, গন্ধর্বদেরও নিমন্ত্রণ হল।

এক ব্রাহ্মণ গেলেন সাগর-তীরে সমুদ্রকে বলে আসতে। তিনি ফুল-পাতা সুগন্ধ জিনিস আর নানা রকম পুজোর উপকরণ নিয়ে গিয়ে, সমুদ্রের স্তব করে, তাঁকে বিক্রমাদিত্যের নিমন্ত্রণ জানালেন। তারপর উত্তরের অপেক্ষায় সেখানে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। নীল সমুদ্রের ঢেউ যেমন পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছিল, তেমনি পড়তে লাগল। কেউ কোনো উত্তর দিল না।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে, ব্রাহ্মণ উঠে পড়লেন। বিফল হয়ে ফিরেই যাবেন ভাবছেন, এমন সময় তাঁর সামনে একজন অপূর্ব চেহারার ব্রাহ্মণ

দেখা দিলেন। তাঁর সমস্ত দেহ থেকে আলোর ছটা বেরোচ্ছিল, প্রশান্ত গম্ভীর তাঁর মুখ।

সেই দেবতার মতো ব্রাহ্মণ বললেন, "রাজা বিক্রমাদিত্য যে আমাদের আদর করে ডেকেছেন তাতে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। দুঃখের বিষয় কতগুলো বিশেষ কর্তব্যের জন্য আমি নিজে যেতে পারছি না। কিন্তু সত্যিকার যে বন্ধু, সে কাছেই থাক বা দূরেই থাক, তার প্রতি ভালোবাসা এতটুকু কম হয় না। কাছে এলেই যাকে ভালো লাগে, দূরে গেলে ভুলে যাওয়া যায়, সে প্রকৃত বন্ধু নয়। রাজার এই দান যজ্ঞে আমি যে কত আনন্দিত, তার চিহ্ন স্বরূপ তাঁকে এই চারটি রত্ন দিলাম। প্রথম রত্নের সাহায্যে যে ধন চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় রত্ন সৈন্য আর শক্তি দেয়। চতুর্থ রত্নের সাহায্যে গয়নাগাঁটি পাওয়া যায়।"

ব্রাহ্মণ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রত্ন নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। এদিকে সেখানকার যজ্ঞ শেষ, রাজার ধনরত্নও সব দান হয়ে গেছে। দক্ষিণা পেয়ে যে যার খুশি হয়ে বিদায় নিয়েছে। কত দুঃখীর মুখে হাসি ফুটেছে, অনাহারীর ঘরে হাঁড়ি চড়েছে। কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণকে কি দেবেন? কিছুই যে বাকি নেই।

রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, "এই চারটি রত্নের মধ্যে তোমার যেটি পছন্দ, সেটি নাও।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "বাড়ি গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।"

জিজ্ঞাসা করতেই স্ত্রী বললেন, "যাতে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়, সেইটে নাও। খাওয়ার মতো সুখ আর কিছুতেই নেই।"

ছেলে বলল, "যাতে সৈন্য আর শক্তি পাওয়া যায়, সেইটে নিন। শক্তি থাকলে সব হয়।"

ছেলের বৌ বলল, "যাতে গয়না পাওয়া যায়, সেইটে নিন। গয়নার মতো আছে কি?"

ব্রাহ্মণ নিজে বললেন, "যাতে ধন পাওয়া যায়, সেটিকেই তো শ্রেষ্ঠ মনে হয়। ধন দিয়ে সব কেনা যায়।"

রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তিনি চারজনের চার রকম মতের কথা

বললেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা চারটি রত্নই তাঁকে দান করলেন।'

গল্প শেষ করে সুপ্রভা বলল, 'মহারাজ, আপনি যদি এই রকম দাতা হয়ে থাকেন, তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ মাথা নিচু করে সরে দাঁড়ালেন।

সাত

তার পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে চড়তে যাবেন, চতুর্থ পুতুল বলল 'মহারাজ, আমার নাম ইন্দ্রসেনা। আগে আমার গল্পটি শুনুন, তারপর সিংহাসনে বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সব জ্ঞানে, সব বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ যে তাঁর ছেলে ছিল না। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন মাথায় জটা, ষাঁড়ের পিঠে চড়ে স্বয়ং মহাদেব তাঁকে বললেন, "তুমি প্রদোষ ব্রত পালন কর; তাহলে তোমার ছেলে হবে।"

ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সময়ে ঐ ব্রত করলেন। কয়েক মাস পরে তাঁর একটি সুন্দর ছেলেও হল। ব্রাহ্মণ তার নাম রাখলেন দেবদত্ত। দেবদত্তর মুখে ভাত দেওয়া হল, তারপর পৈতে হল। তার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল; দেখতে দেখতে সেও সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল।

দেবদত্তর যখন ষোল বছর বয়স হল, তাঁর বাবা তাঁর বিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে কাশী গেলেন। যাবার আগে ছেলেকে বললেন, "কখনো ধর্ম ছাড়বে না, ভগবানে ভক্তি রাখবে, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না, পরের জিনিসে লোভ করবে না, কথা দিলে কথা রাখবে, নিজের অবস্থা বুঝে টাকা খরচ করবে, জীব মাত্রে দয়া করবে, খারাপ লোকের সঙ্গে মিশবে না, সাধুদের সেবা করবে আর মেয়েদের কাছে কখনো গোপন কথা বলবে না। এই জীবন কাটালে তুমি সুখী হবে।"

মা-বাপ তীর্থে গেলে দেবদত্ত ঐ উপদেশ মতো দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন তিনি হোমের জন্য শুকনো কাঠ আনতে ঘন বনে গেছেন। সেখানে রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা। রাজা শিকার করতে করতে ঘন বনে ঢুকে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দেবদত্ত তাঁকে যত্ন করে পথ দেখিয়ে রাজধানীতে পৌঁছে দিলেন। রাজা এত খুশি

হলেন যে দেবদত্তকে তাঁর রাজকার্যে বিশেষ সম্মানের কাজ দিলেন।

এর পর অনেক দিন কেটে গেলেও রাজার মনে হত এখনো দেবদত্তর ঋণ শোধ হয়নি। এই নিয়ে তাঁকে দুঃখ করতে শুনে, দেবদত্ত ঠিক করলেন রাজার এই দুঃখটা সত্যি কি না পরীক্ষা করতে হবে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। একদিন রাজার ছেলেকে দেবদত্ত নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে, তার গায়ের কয়েকটা গয়না চাকরের হাতে স্যাকরার কাছে বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে দেবদত্ত চাকরকে নিয়ে কোটালের লোকরা হাজির হল। "মহারাজ! সর্বনাশ হয়েছে। এ নিশ্চয় রাজকুমারকে মেরে ফেলে গয়না বেচতে এসেছে!"

হাতে হাতকড়া পরিয়ে সে বেচারাকে রাজসভায় নিয়ে আসা হল। জেরা করতেই সে বলল, "আমি কিছু জানি না, ধর্মাবতার। আমার মুনিব দেবদত্ত এই গয়না বেচে দিতে বলেছেন।"

শুনে সকলের চক্ষুস্থির। লোকটা বলে কি? দেবদত্তর মতো জ্ঞানী-গুণী সৎ মানুষ সারা রাজ্যে আর নেই। তিনি কেন কয়েকটা তুচ্ছ টাকার জন্য এমন জঘন্য কাজ করতে যাবেন! তাঁর কিসের অভাব?

রাজপুরুষরা দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি এমন কাজ করলেন। দেবদত্ত খালি বললেন, "কি জানি কেমন দুর্বুদ্ধি হল। লোভে পড়ে করে ফেলেছি। আপনারা আমাকে যা ইচ্ছা দণ্ড দিন।"

বিক্রমাদিত্য দুঃখে, হতাশায় চুপ করে রইলেন। রাজপুরুষরা বললেন, "টাকার লোভে ইনি ছোট ছেলেকে মেরে ফেলেছেন। এঁর প্রাণদণ্ড হোক। এঁর শরীরটাকে একশো টুকরো করে কেটে, শকুন দিয়ে খাওয়ানো হোক। মহারাজ হুকুম দিন।"

এতক্ষণে বিক্রমাদিত্য কথা বললেন, "আমার কর্মফলের জন্যেই আমি ছেলেকে হারিয়েছি। ইনি একদিন আমার পরম উপকার করেছিলেন। এখনো ইনি আমার আশ্রয়ে আছেন। এঁর চুলের ডগাতেও যেন কেউ হাত না দেয়। আমি বুঝেছি যে উপকারী যদি একবার উপকার করে, অনেক জন্মেও সে ঋণ শোধ হয় না।"

এই বলে অনেক টাকাকড়ি, কাপড়চোপড় উপহার দিয়ে, রাজা বিক্রমাদিত্য দেবদত্তকে সম্মানের সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

দেবদত্তও সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে রাজকুমারকে এনে রাজার কোলে দিলেন। সভাসুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত। বিক্রমাদিত্য বললেন, "এ কি, দেবদত্ত ?"

দেবদত্ত বললেন, "আপনি একদিন বলেছিলেন উপকারীর উপকার কখনো শোধ করা যায় না। আমার তখন বিশ্বাস হয়নি যে এটা আপনার মনের কথা। তাই আপনাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। মহারাজ, আপনার মতো সত্যবাদী, ত্যাগী, পরোপকারী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর নেই।"

গল্প শেষ করে ইন্দ্রসেনা বলল, 'মহারাজ, আপনার মধ্যেও যদি বিক্রমাদিত্যের এই সব গুণ থাকে, তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসার যোগ্য।'

ভোজরাজ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন আর সিংহাসনে উঠবার চেষ্টা করলেন না।

আট

তার পরদিন ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উঠতে যাবেন, পঞ্চম পুতুল বাধা দিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার নাম সুদতী। আমার কথা আগে শুনুন, তারপর সিংহাসনে বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন সভায় বসেছেন, এমন সময় একজন জহুরী এসে তাঁকে একটা উজ্জ্বল রত্ন দিলেন। রাজার বিশেষজ্ঞরা সেই রত্ন দেখে বললেন, "ওঁর কাছে কি এই রকম আরো রত্ন আছে ?"

জহুরী বললেন, "আরো দশটি আছে।"

বিশেষজ্ঞরা তখন একেকটি রত্নের দাম ঠিক করলেন ছয় কোটি মোহর। রাজা সবগুলি কিনে নিতে চাইলেন। সেজন্য তাঁর নিজের মণিকার, টাকা নিয়ে জহুরীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

রাজা মণিকারকে বললেন, "আট দিনের মধ্যে যদি ফিরে আসতে

পার, তাহলে অনেক উপহার পাবে।” জহুরীর বাড়ি খুব কাছে ছিল না। সেখানে গিয়ে, মণি কিনে, মণিকার যখন রওনা হলেন, তখনি আকাশে মেঘ জমছিল।

রাজধানীর পথে একটা নদী; সেটি নৌকো করে পার হতে হবে। মণিকার সেখানে পৌঁছে দেখেন, জল দুই তীর ছাপিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝি পার করতে নারাজ। সে বলল, “যার নখ বা শিং আছে, যার রাজকুলে জন্ম, যার হাতে অস্ত্র, মেয়েমানুষ আর নদী—এদের কাউকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। জল একটু নামলে, পার করে দেব।”

মণিকার কিছুতেই ছাড়েন না। রাজার কাছে আজই এই দশটি রত্ন পৌঁছে না দিলে, তিনি অসন্তুষ্ট হবেন।

মাঝি বলল, “ওর পাঁচটি আমাকে দিলে, এখনি পার করে দিই।”

তাই দিলেন রত্নাকর। তারপর হন্তদন্ত হয়ে, আট দিন পূর্ণ হবার আগেই রাজার কাছে গিয়ে পাঁচটি রত্ন নিয়ে দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন, “আর পাঁচটি কোথায়?”

মণিকার সব কথা খুলে বললেন। শেষে বললেন, “কথা দিয়ে গিয়েছিলাম মহারাজের আদেশ পালন করব, তাই এমন করলাম।”

রাজা খুশি হয়ে বাকি পাঁচটি রত্ন তাঁকে দান করলেন।

মহারাজ, আপনিও যদি এই রকম দান করতে পারেন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।’

ভোজরাজ বসলেন না, চুপ করে রইলেন।

নয়

তার পরদিন রাজা সিংহাসনের কাছে যেতেই আরেক পুতুল বলল, ‘মহারাজ, আমার নাম অনঙ্গনয়না, আমার কথা শুনুন।

সেকালে রাজা বিক্রমাদিত্য একবার চৈত্র মাসে বসন্ত উৎসবের সময়ে, যখন ডালে ডালে ফুল, দিকে দিকে পাখির গান, আকাশ ভরা মৃদু বাতাস, চাঁদের আলো, সেই সময় সখীদের নিয়ে তাঁর প্রমোদবনে কয়েক দিন উৎসব করতে গেলেন।

ঐ বনে একজন ব্রহ্মচারী থাকতেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বিয়ে-থা করেননি, বাগানের এক কোণে চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে ধ্যান

করে তাঁর দিন কাটত। সেদিন হঠাৎ তাঁর কি হল, মনে হল, "এ ভাবে জগতের সব সুখ আরাম বাদ দিয়ে তাপসীর জীবন কাটানো বড়ই বোকামি। আমি বৃথাই এত বছর কাটিয়েছি। তার চেয়ে যদি বিয়ে করে, সুখে আর আরামে ঘরকন্না করতাম, তাহলে কত ভালো হত। রাজার কাছে আমার মনের বেদনা জানালে তিনি হয়তো আমার দুঃখ দূর করতে পারেন।"

এই ভেবে ব্রহ্মচারী রাজাকে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আমি পঞ্চাশ বছর ব্রহ্মচারী হয়ে চণ্ডিকাদেবীর সাধনা করেছি। দেবী আমাকে বিয়ে করে সংসারী হতে বলেছেন।"

রাজা বুঝতে পারলেন দেবী সে-রকম কিছুই বলেননি, তবে সন্ন্যাসীর সংসার করার ইচ্ছে হয়েছে। এই কথা মনে হতেই বিক্রমাদিত্য ব্রহ্মচারীর জন্য একটি সুন্দর শহরের পত্তন করে, তাঁকে তার রাজা করে দিলেন। শহরের নাম হল চণ্ডিকাপুর।

তারপর নতুন রাজাকে একশোজন সুন্দরী রানী, পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচশো ঘোড়া আর চার হাজার সৈনিক এবং খরচ চালাবার জন্য প্রচুর টাকাকড়ি দিলেন। এইভাবে প্রার্থীকে মিথ্যাবাদী জেনেও রাজা তার ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

আপনিও কি এ রকম করতে পারবেন? তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

রাজা চুপ করে রইলেন। আরেক দিন কেটে গেল।

দশ

তার পরদিন ভোজরাজ সপ্তম পুতুলের মাথায় পা দিতে গেলেই, সে বলল, 'মহারাজ, আমার নাম কুরঙ্গনয়না। বিক্রমাদিত্যের আরেকটি গল্প শুনুন।

বিক্রমাদিত্য যখন রাজত্ব করতেন, তখন দেশে কোনো অন্যায় বা অশান্তি ছিল না। কেউ কাউকে হিংসা করত না। কেউ অন্যের জিনিসে লোভ করত না। পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা আচরণ, অপরকে ঠকানো —এসব ছিল না। সকলেই ছিল উদার, সত্যবাদী, ধার্মিক।

রাজবাড়ির কাছেই ধনদ নামে এক সওদাগর থাকতেন। এমন কোনো মূল্যবান জিনিস ছিল না, যা তাঁর ঘরে নেই। হঠাৎ এই

লোকটির মনে সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মাল। তাঁর মনে হল যে সব জিনিস চিরকালের নয়, যা দুদিনেই শেষ হয়, নষ্ট হয় তার কোনো মূল্যই নেই। বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, যশ-মান-খ্যাতি কোনোটাই চিরকাল থাকে না। কাজেই এ-সব ত্যাগ করা উচিত। ধন-সম্পদ সৎপাত্রে দান করে ধর্ম-কর্মে মন দেওয়া উচিত।

তাই করলেনও তিনি। বেদ-পড়া ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জেনে নিলেন কাকে কোন্ জিনিস কি ভাবে দান করতে হয়। সেই ভেবে দান করলেন। দানের পর মনটা পবিত্র হয়ে গেল। ধনদ ভাবলেন, "যাই দ্বারকায়, গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজো করে আসি।"

এই ভেবে সমুদ্রেব ধারে গেলেন। সেখানে দেখলেন অনেক নাবিক, মজুর, বিদেশী, ভিখারী, যোগী, অনাথের ভিড়। তাদের হাত ভরে দান করলেন ধনদ। তারপর নৌকো ভাড়া করে তাদের নিয়ে যাত্রা করলেন।

কয়েক দিন পরে দেখলেন সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপ। দ্বীপে প্রকাণ্ড একটা মন্দির। মন্দিরে ভুবনেশ্বরী দেবীর মূর্তি। ধনদ ঘটা করে পূজো দিলেন। হঠাৎ বাঁ দিকে চেয়ে দেখেন মুণ্ডু-কাটা দুটি মৃতদেহ। সেখানকার দেয়ালে লেখা আছে—যদি কেউ নিজের গলা কেটে সেই রক্ত দিয়ে ভুবনেশ্বরীর অর্চনা করে, তাহলে এরা বেঁচে উঠবে।

এই সব দেখা হলে, ধনদ আবার নৌকোয় চড়ে দ্বারকায় গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পূজো করে আবার দেশে ফিরে গেলেন।

নিজের নগরে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ আর কিছু উপহার নিয়ে ধনদ বিক্রমাদিত্যকে দেখতে গেলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁকে তাঁর তীর্থযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করলে, ধনদ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরের সেই দুটি মরা মানুষ আর ঐ লেখাটির কথাও বললেন।

শুনে বিক্রমাদিত্য আর স্থির থাকতে পারলেন না। ধনদকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে গিয়েই মৃতদেহ দুটির ওপর তার চোখ পড়ল। আর বৃথা সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলির খড়্গ তুলে নিয়ে দেবীর নাম নিয়ে যেই নিজের গলায় বসাতে যাবেন, অমনি মৃতদেহ দুটি জীবন্ত হয়ে উঠল। দেবীও রাজার হাত থেকে

খড়্গ কেড়ে নিয়ে বললেন, "আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "তাই যদি হয়, মা, এঁদের দুজনকে রাজ্য দান কর।" দেবী তাই করলেন, রাজাও আনন্দিত মনে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

আপনিও কি পারতেন এ-রকম করতে, মহারাজ? পারলে সিংহা-সনে বসুন।'

ভোজরাজ কোনো কথা বললেন না।

এগার

তার পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে চড়তে গেলে, অষ্টম পুতুল বলল, 'আমার নাম লাবণ্যবতী। বিক্রমাদিত্যের আরেকটি গল্প শুনুন।

রাজাদের কাজই হল দেশের মঙ্গল বিধান করা; সৎ ভাবে দেশের আর্থিক উন্নতি করা; যে অন্যায় করে, তাকে সাজা দেওয়া; যে সাধু, তাকে পালন করা; শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করা আর সব চেয়ে বড় কাজ হল দুঃখীদের দুঃখ দূর করা।

বিক্রমাদিত্য এ-কথা জানতেন। তাই তিনি দেশের সব জায়গায় চর পাঠিয়ে, কোথায় কেমন অবস্থা তার খোঁজ নিতেন। চররা ফিরে এসে মাঝে মাঝে ভারি আশ্চর্যের বা মজার ব্যাপারের বর্ণনা দিত।

একবার একজন বলল, "মহারাজ, কাশ্মীরে গিয়ে দেখলাম এক মহা ধনী বণিক পাঁচ ক্রোশী এক পুকুর কাটিয়েছেন। তার মধ্যিখানে জলের তলায় লক্ষ্মী-নারায়ণের বিশ্রাম-ঘর তৈরি হয়েছে। সবই হয়েছে, কিন্তু পুকুরে কিছুতেই জল উঠছে না।

কত জপ-তপ-পূজো হয়েছে; সব বৃথা। একদিন দৈববাণী শোনা গেল যে বত্রিশটি শুভ-লক্ষণধারী কোনো পুরুষ যদি নিজের গলা কেটে রক্ত দিয়ে বিষ্ণুর পূজো করেন, তবেই জল উঠবে।

ওখানে অন্নসত্র খোলা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে ঐ রকম লক্ষণ-ধারী কোনো পুরুষ রক্ত দিলে, অনেক সোনার মোহর পুরস্কার পাবে। কিন্তু কেউ এগোচ্ছে না।"

এ কথা শুনেই বত্রিশ লক্ষণধারী বিক্রমাদিত্য সেখানে গিয়ে দেবতার পূজো করে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "হে দেবতা, তুমি যার গলার রক্ত

চেয়েছ, আমি সেই বত্রিশ-লক্ষণধারী পুরুষ। আমি আমার রক্ত দিবেদন করছি, তুমি দয়া করে জলাশয় জলে ভরে দাও।"

এই বলে খড়্গ তুলে গলায় বসাতে যাবেন, এমন সময় লক্ষ্মীদেবী তাঁর হাত ধরে ফেলে বললেন, "বাছা, বর নাও।" রাজা বললেন, "এই জলাশয় জলে ভরে দাও, মা।" রাজা পাড়ে উঠে পড়তে না পড়তেই পুকুর কানায় কানায় জলে ভরে গেল। রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।

পারেন মহারাজ, এই রকম পরোপকার করতে! তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজের সেদিনও সিংহাসনে বসা হল না।

বারো

পরদিন সকালে নবম পুতুল বাধা দিয়ে রাজাকে বললে, 'আমার নাম কাম-কলিকা। একটা গল্প শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরোহিতের নাম ছিল ত্রিবিক্রম। তিনি পরম জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে কমলাকরের স্বভাব ভালো ছিল না। পড়াশুনা তো করতই না, নানা রকম বদ্ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাত। শুধু খেতে আর শুতে বাড়ি আসত।

একদিন ত্রিবিক্রম তাকে ডেকে বললেন, "দেখ বাবা, এই লেখাপড়া শেখার সময় যদি তুমি খালি বদ্ খেয়ালে কাটাও, তাহলে পরে বড় কষ্ট পেতে হবে। যার হাতে বিদ্যা আছে, তার কোনো ভয় নেই। বিদ্যা তার সব অভাব দূর করবে, তাকে সম্মান দেবে, আশ্রয় দেবে, সুখ দেবে, বুড়ো বয়সে আরাম আর শান্তি দেবে। কিন্তু যে তোমার মতো অল্প বয়সে শুধু আমোদ-প্রমোদ করে কাটায়, সে ক্রমে ক্রমে পশুর মতো হয়ে যায়, তার মনুষ্যত্বের কিছুই বাকি থাকে না।"

বাপের বকুনিতে কমলাকরের যেমন দুঃখ তেমনি লজ্জা হল। সে ঠিক করল বাড়ি থেকে দূরে কোথাও গিয়ে, যেমন করে হোক বিদ্যা শিখতে হবে। তার আগে বাপের কাছে মুখ দেখাবে না।

এই ভাবে সে কাশ্মীরে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি ভট্টর কাছে উপস্থিত হয়ে, দিনরাত তাঁর সেবা করতে লাগল। অনেক

দিন কেটে গেল ; তারপর গুরুর দয়া হল। তিনি কমলাকরকে সিদ্ধ সারস্বত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। তার সাহায্যে কমলাকর সর্বজ্ঞ হয়ে উঠল।

এখন আর বাবার কাছে ফিরে যেতে কোনো বাধা রইল না। কমলাকর বাড়ির পথ ধরে, এক সময় কাঞ্চীনগরে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে গিয়ে এক অদ্ভুত গল্প শুনল। ঐ শহরে নরমোহিনী বলে একজন সুন্দরী মহিলা থাকে। তার বাড়িতে কেউ অতিথি এলে, রাতে একটা রাক্ষস এসে অতিথির রক্ত চুষে খায়। তার ফলে সে বেচারা মারা যায়।

কমলাকর বাড়ি পৌঁছলে, তাকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিবিক্রম রাজাকে আশীর্বাদ করতে গেলেন। বিক্রমাদিত্য কমলাকরকে দেখে খুশি হয়ে নানা উপহার দিলেন। পরে বললেন, "এত দেশ দেখে এলে, তার মধ্যে আশ্চর্য কিছু দেখনি ?" কমলাকর তখন কাঞ্চীনগরের রাক্ষসের কথা বলল।

রাজা বললেন, "চল, দুজনে সেখানে যাই।"

গেলেন দুজনে কাঞ্চীনগরে। বিক্রমাদিত্য নরমোহিনীর বাড়িতে যেতেই, সে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে, সেখানে খেয়ে যেতে বলল। রাজা বললেন, "আমি খেয়ে এসেছি।" নরমোহিনী ওঁকে পান খেতে দিয়ে, আর একটু রাত হলে শুতে গেল। রাজা জেগে রইলেন।

গভীর রাতে রাক্ষস এল। তার পায়ের শব্দ শুনেই, রাজা একটা সিন্দুকের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

রাক্ষস নরমোহিনীর ঘরে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে আছে। অতিথিকে খুঁজতে যেই সে ঘর থেকে বাইরে এসেছে, রাজাও তার মাথায় তলোয়ারের এক কোপ বসিয়ে দিয়েছেন! বিকট চীৎকার করে রাক্ষস সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

চীৎকার শুনে নরমোহিনীর ঘুম ভেঙে গেল। সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, রাক্ষসের মৃতদেহ দেখে, রাজার কাছে কেঁদে পড়ল, "মহারাজ, এতদিন পরে আপনি আমার জীবনটাকে বিপদ থেকে মুক্ত করলেন। এ ঋণ আমি কি করে শোধ করব ? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "তাহলে আমার প্রিয় পাত্র কমলাকরকে বিয়ে

করে, তার সঙ্গে সুখে জীবন কাটাও।”

এই উপদেশ দিয়ে রাজা উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

মহারাজ, আপনিও যদি বিক্রমাদিত্যের মতো পরোপকারী হন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।’

ভোজরাজ সেদিনও সিংহাসনে চড়লেন না।

তেরো

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে উঠতে গেলেই দশম পুতুল বলল, ‘মহারাজ, আগে আমার একটি গল্প শুনুন। আমার নাম চণ্ডিকা।’

বিক্রমাদিত্য যখন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন, তখন এক যোগী সেখানে উপস্থিত হলেন। শোনা গেল এমন কোনো বিদ্যা নেই, যা তিনি রপ্ত করেননি। কথাটা রাজার কানে যেতেই তিনি পুরোহিত পাঠিয়ে যোগীকে কাছে ডাকলেন।

যোগী কাছে এসে তাঁকে বললেন, “শোন রাজা, এমন মন্ত্রও আছে, যার ফলে তুমি জরা-মরণ-রহিত হবে। তার মানে কখনো বুড়োও হবে না, মরবেও না।”

বিক্রমাদিত্য বললেন, “সেই মন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দিন।” যোগী তাঁকে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, “এক বছর সন্ন্যাসীর মতো থাকবে, কোনো সাংসারিক সুখ ভোগ করবে না। রোজ ঐ মন্ত্র জপ করবে আর দূর্বাঘাস দিয়ে মন্ত্র জপের দশ ভাগের এক ভাগ হোমের আগুনে দেবে। এক বছর পরে যেদিন জপ, হোম শেষ হবে, সেদিন আগুন থেকে একজন দিব্য পুরুষ বেরিয়ে এসে তোমাকে একটা ফল দেবেন। ঐ ফল খেলে তুমি কখনো বুড়োও হবে না, মরবেও না। চিরকাল এই ভাবে প্রজাপালন করতে পারবে।”

যোগীর কথামতো রাজা নগরের বাইরে এক নির্জন জায়গায়, এক বছর সন্ন্যাসীর মতো দিন কাটালেন। তারপর ঐ ভাবে জপ, হোম করলেন। হোমের শেষে সেই দিব্য পুরুষ আগুন থেকে বেরিয়ে তাঁকে একটি ফল দিলেন। ফলটি হাতে নিয়ে রাজা রাজধানীর পথ ধরলেন।

এমন সময় একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে কেঁদে পড়ল, “মহারাজ, রাজাই হলেন প্রজাদের মা-বাপ। এই দুর্দিনে আপনি ছাড়া আমার

কে-ই বা আছে ? আমার বাড়ির আশ্রয়, টাকাকড়ি, দেহের স্বাস্থ্য, মনের সুখ, সব গেছে। ধর্মকর্ম করে যে শান্তি পাব, তারও উপায় দেখছি না। আপনি যেমন করে পারেন, আমাকে বাঁচান।”

রাজা সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠরোগীকে সেই অমৃত-ফলটি দিয়ে, প্রসন্ন মনে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

পারতেন মহারাজ, এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে ?’

রাজা মাথা নীচু করে রইলেন। সিংহাসন শূন্য রইল।

চোদ্দ

পরদিন একাদশ পুতুল বিদ্যাধরী ভোজরাজকে বলল, ‘মহারাজ, আগে আমার কথা শুনুন।

সেকালে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সময়ে দেশের কোথাও কোনো অন্যায় কাজ হত না। মন্দ লোকেরা সাজা পেত, সৎ লোকদের রাজা পালন করতেন।

একবার তাঁর নানা দেশে ভ্রমণ করবার ইচ্ছা হল। তিনি মন্ত্রীর হাতে শাসনের ভার দিয়ে, যোগী সেজে বেরিয়ে পড়লেন। কত দেশে কত অপূর্ব দৃশ্য, কত অদ্ভুত ঘটনা দেখলেন তার ঠিক নেই। একবার পথ চলতে চলতে এক ঘন বনের মধ্যিখানে রাত হয়ে গেল। কোথাও কোনো ঘরবাড়ি বা গুহা না দেখে রাজা মস্ত এক বটগাছের নিচে আশ্রয় নিলেন।

ঐ গাছে চিরঞ্জীব নামে এক বুড়ো পাখি থাকত। এখন তার বয়স হয়েছে, খাবারের খোঁজে কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু তার অনেক ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি। তারা সবাই ঐ বিশাল গাছেই থাকে। ভোরবেলা তারা নানা জায়গায় চরতে যায়, সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে এসে, বুড়ো পাখিকে নানারকম মিষ্টি ফলমূল খাওয়ায় আর কে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস দেখে এসেছে, তার রোমাঞ্চকর গল্প বলে।

চিরঞ্জীব বড়ই সুখী। সেদিন কিন্তু একটি পাখি কেমন মনমরা হয়ে ছিল। সে কি দেখেছে জিজ্ঞাসা করাতে, পাখি বলল, “আমি কিছুই দেখিনি। আজ আমার মন বড় খারাপ।”

চিরঞ্জীব বলল, “কেন মন খারাপ বাছা ?”

"তাহলে শুনুন। উত্তর দেশে এক পাহাড়ের পাশে পলাশনগর। ঐ পাহাড়ে বক-রাক্ষস থাকে। রোজ তার খাবার জন্য গ্রাম থেকে একটা মানুষ দিতে হয়। কাল যে ব্রাহ্মণের পালা, সে আমার আর জন্মের বন্ধুর একমাত্র ছেলে।"

পাখির এই গল্প গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে বিক্রমাদিত্যও শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পলাশনগরের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে, পাখির আর-জন্মের বন্ধু সেই ব্রাহ্মণকে সাহস দিয়ে, রাজা বক-রাক্ষস যেখানে রোজ আসে সেখানে গিয়ে, যে-পাথরে সে মানুষ মারে, তার ওপর বসে রইলেন।

রাক্ষস এসে তাঁর হাসিমুখ দেখে অবাক হয়ে বলল, "মরণকে ভয় পাও না, তুমি কে?"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "তা দিয়ে কি হবে? তুমি আমাকে খাবে বলে আমি এসেছি, তোমার কাজ তুমি কর।"

রাক্ষসের মন ফিরে গেল, "আহা, ইনি কত বড় সাধু পুরুষ যে অন্যের জন্য প্রাণ দিতে এসেছেন! এত বড় পরোপকারী জগতে দেখা যায় না। ইনি ধন্য! এঁকে মারলে আমার মহা পাপ হবে। হে পুণ্যবান, তোমার উপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।"

রাজা বললেন, "তাহলে আজ থেকে আর মানুষ খেয়ো না। তোমার প্রাণ তোমার কাছে যত প্রিয়, সব মানুষের প্রাণই তাদের কাছে তেমনি প্রিয়। জগতে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, লোকের মনে সদাই ভয়। তাদের রক্ষা কর।"

রাক্ষস বিনীত ভাবে বলল, "তাই হবে, মহারাজ।" সেদিন থেকে সে জীব-হত্যা ছেড়ে ছিল। তার স্বভাব বদলে গেল।'

গল্প শেষ করে বিদ্যাধরী বলল, 'পারবেন মহারাজ, এই ভাবে নিজেকে বলিদান করতে? তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

সেদিনও ভোজরাজের সিংহাসনে বসা হল না।

পনেরো

তার পরদিন দ্বাদশ পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম প্রজ্ঞাবতী। আমিও একটা গল্প বলব।

সেকালে যখন বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, ঐ নগরে রুদ্রসেন বলে এক ধনী বণিক থাকতেন। তিনি যথেষ্ট হিসাবীও ছিলেন বলে মারা যাবার সময়, একমাত্র ছেলে পুরন্দরকে অনেক ধনসম্পদ দিয়ে গেলেন।

পুরন্দর ছিল ঠিক তাঁর উল্টোটি। সে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করে দু হাতে টাকাকড়ি ওড়াতে লাগল। প্রকৃত বন্ধুও দু-একজন যারা ছিল, তারা ওকে সাবধান করে দিতে গেলে, তাদের কথা সে কানেই তুলল না।

ফলে যা হবার তাই হল। পুরন্দর একদিন একেবারে দেউলে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব ইয়ার-বন্ধুরা যে যার খসে পড়ল। ওর বাড়িতে কেউ আর আসত না। পথে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এতদিনে পুরন্দরের চোখ ফুটল। সে মনে ভাবল, 'যা শুনেছিলাম, তার দেখছি সবই সত্যি। যার টাকা নেই, তার কেউ নেই, কিছু নেই। এখানে আর কিসের জন্য পড়ে থাকি ?'

এই ভেবে সে দেশান্তরী হল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যায় সে হিমালয়ের পায়ের কাছে এক গ্রামে পৌঁছল। সে রাতের মতো পুরন্দর এক গৃহস্থের বাড়ির চাতালে শুয়ে রইল। কাছেই একটা বাঁশবন ছিল। রাত দুপুরে সেই বাঁশবন থেকে মেয়েমানুষের কান্নার শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু একলা গিয়ে খোঁজ করার সাহস হল না।

পরদিন সকালে গৃহস্থ বললেন যে রোজ রাতে ঐ রকম কান্না শোনা যায়। কিন্তু ভূতের ভয়ে গাঁয়ের লোকরা ওদিকে যায় না।

উজ্জয়িনীতে ফিরে গিয়ে পুরন্দর বিক্রমাদিত্যের কাছে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলল। শুনেই রাজা বললেন, "তাহলে আমাদের এখনি সেখানে যাওয়া দরকার। নিশ্চয় কোনো পাষণ্ড কোনো অনাথা মেয়ের উপর অত্যাচার করে।"

দুজনে সেখানে গেলেন। সে রাতেও বাঁশবন থেকে কান্না শোনা গেল। অমনি তলোয়ার হাতে রাজা বাঁশবনের মধ্যে ছুটে গিয়ে দেখলেন একটা বিকট রাক্ষস একটি অসহায় মেয়েকে বেদম মারছে।

রাজা চেঁচিয়ে বললেন, "ও কি! ওকে মারছ কেন?" রাক্ষস বলল,

“তোমার তা দিয়ে কি দরকার ? নিজের পথ দেখ, নয়তো তোমাকেও মেরে লাশ বানাব।”

আর যায় কোথায়! বিক্রমাদিত্য তলোয়ার নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মাথাটি ধড় থেকে নামিয়ে দিলেন।

রাক্ষস মরেছে দেখে সেই মেয়েটি তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ল, “আপনি আমাকে অসহ্য দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। আমি রূপের গর্বে আমার স্বামীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম। মারা যাবার সময় তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন—যতদিন না একজন মহাপুরুষ এসে তোকে উদ্ধার করেন, ততদিন এই দুর্বৃত্ত রাক্ষস রোজ রাতে তোকে অমানুষিক ভাবে মারধোর করবে। আমার সব ধন-সম্পত্তি রইল, সেই মহাপুরুষকে দিস্।”—এই বলে মেয়েটি এক কলসি হীরে জহরৎ এনে রাজাকে দিল।

রাজা তখুনি সেই ঘড়া আর মেয়েটিকে পুরন্দরের হাতে দিলেন। সে তাকে বিয়ে করে, সুখে দিন কাটাতে লাগল। তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিল।’

গল্প শেষ করে প্রভাবতী বলল, ‘আপনিও যদি এই রকম ধীর বুদ্ধি-মান হয়ে থাকেন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।’

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

ষোল

তার পরদিন ভোজরাজ আসতেই ত্রয়োদশ পুতুল বলল, ‘মহারাজ, আমার নাম জনমোহিনী। আমার কিছু বলবার আছে।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য যোগীর বেশে দেশ ভ্রমণে বেরোলেন। তিনি সন্ধ্যায় কোনো গ্রামে পৌছলে সেখানে এক রাত আর কোনো শহরে পৌঁছলে পাঁচ রাত কাটাতেন।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নদীর ধারে এক শহরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে নদীর কিনারায় সুন্দর একটি মন্দির দেখলেন। তার চাতালে বসে পাঠকরা পুরাণ থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন আর শহরের বিশিষ্ট বাসিন্দারা তাঁদের ঘিরে বসে পাঠ শুনছিলেন।

বিক্রমাদিত্যও স্নান করে পূজো সেরে, সেখানে এসে বসলেন। সে-

দিন পাঠকরা পরপোকারের কথা বলছিলেন। মানুষের সাংসারিক সুখ-ঐশ্বর্য, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ছুদিনের জিনিস। একমাত্র ধর্মকর্মই চির-দিনের। আবার সব রকম ধর্মকর্মের মধ্যে পরপোকারের তুলনা নেই। যে দুঃখিত মানুষকে দেখলে দুঃখ পায়, সুখী মানুষ দেখলে সুখী হয়, সে-ই যথার্থ ধার্মিক। আবার যে ভয়ক্লিষ্টকে অভয় দেয়, সব ধার্মিকদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ। দুঃখের বিষয় সোনা দান করার, জমি দান করার লোক যদি বা পাওয়া যায়, জীবমাত্রকে অভয় দেয় এমন লোক প্রায় দেখাই যায় না।

এই সব বলছেন পাঠকেরা আর যাঁরা শুনছেন তাঁরা সায় দিচ্ছেন, এমন সময় এক বুড়ো ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রী নদী পার হতে গিয়ে প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেন। বুড়ো বেচারি ভেসে যেতে যেতে আকুলভাবে ডাকতে লাগলেন, "আপনারা আসুন, আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, নইলে প্রাণ যায়!"

সকলেই ব্যস্ত হয়ে সেদিকেই তাকালেন, কিন্তু কেউ এক পা নড়লেন না। শুধু রাজা বিক্রমাদিত্য "ভয় নেই! ভয় নেই!" বলে স্রোতের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন আর দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণকে আর তাঁর স্ত্রীকে টেনে এনে তীরে তুলে ফেললেন।

একটু সুস্থ হয়ে ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন, "বন্ধু, আপনি আমাদের নতুন জীবন দিলেন। বাপ-মা একবার প্রাণ দিয়েছিলেন, আপনি আরেকবার দিলেন। এর প্রতিদানে আমার যা পুণ্য জমেছে আর নিজের তপস্যার ফলে যা পেয়েছি, সব আপনাকে দিলাম।" এই বলে রাজাকে আশীর্বাদ করে, তিনি চলে গেলেন।

অমনি বিরাট এক রাক্ষস এসে রাজাকে বলল, "আগে আমিও ব্রাহ্মণ ছিলাম। সারা জীবন পাপ করে কাটিয়েছি, তার ফলে মরে এখন ব্রহ্ম-রাক্ষস হয়ে দশ হাজার বছর কষ্ট পাচ্ছি। আজ আপনার দয়ায় উদ্ধার পাব।"

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্য তাকে ব্রাহ্মণের দেওয়া সব পুণ্য দান করে, হাসিমুখে রাজধানীতে ফিরলেন।' গল্প শেষ করে জনমোহিনী বলল, 'আপনিও যদি এমন দাতা হয়ে থাকেন, তবেই এই সিংহাসনে বসুন।'

রাজা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সতেরো

এই নিয়ে তেরো দিন হল। ভোজরাজ তার পরদিন আবার সিংহাসনে চড়তে গেলেই, চতুর্দশ পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম বিদ্যাবতী। আমার গল্প শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রমণের অভ্যাস ছিল। তিনি দেখে বেড়াতেন প্রজারা কেমন আছে, সাধুরা কি করছেন, তীর্থে কি ঘটছে আর দেবতারাই বা কি বিধান করছেন। রাজা না থাকলে মন্ত্রীরা সুযোগ্যভাবে রাজকার্য করতেন।

একবার নদীর তীরে সুন্দর এক তপোবনের মন্দিরে, যোগীর সাজ পরা রাজার সঙ্গে একজন সত্যিকারের যোগীর দেখা হল। সে যোগী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?" বিক্রমাদিত্য বললেন, "আমি তীর্থযাত্রী।" যোগী বললেন, "না। আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য। আপনাকে আমি চিনি। এ ভাবে মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে, মনের আনন্দে দেশ বেড়ানো আপনার উচিত নয়। যত ভালো মন্ত্রীই হন না কেন, নিজের রাজ্যের বা কোনো মূল্যবান জিনিসের দায়িত্ব নিজের হাতেই রাখা উচিত। কখন কোন দিক থেকে বিপদ আসে কিছুই বলা যায় না। এ ভাবে ঘোরা আপনার কর্তব্য নয়।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "দেবতারা যা বিধান করেন তা হবেই। মানুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও কতটুকু করতে পারে? দেবতারা নিজেরাই দৈবের হাতের পুতুল। অমন ক্ষমতাশালী ইন্দ্রকেও মাঝে মাঝে শত্রুর কাছে পরাজিত হতে হয়। কত বলব? যা ভবিতব্য তা হবেই। একটা গল্প শুনুন—

উত্তরদেশে নদীপর্বতবন্ধন বলে একটা নগর আছে। সেখানে রাজশেখর নামে একজন ধার্মিক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর কুটুম্বরা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, একজোট হয়ে, দিল তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে। রাজা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন।

একবার বনের মধ্যে রাত হওয়াতে, রাজা সপরিবারে গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। ঐ গাছে তিনটি পাখি থাকত। তারা নিজেদের মধ্যে

আলাপ করছিল। এক পাখি বলল, এদেশের রাজা মারা গেছেন। তাঁর ছেলে নেই। তাহলে কে রাজা হবে ? আরেক পাখি তাতে বলল, এই গাছের তলায় যে রাজা বসে আছেন, তিনিই এদেশের রাজা হবেন। তৃতীয় পাখি বলল, আহা, তাই হোক। রাজা গাছতলা থেকে সব কথাই শুনলেন।

এদিকে ভোর হতেই পাখিরা যে যার কাজে ব্যস্ত হল। রাজা তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক সারলেন। তারপর বন ছেড়ে রাজপথে এসে উঠলেন। এমন সময় সুন্দর সাজ পরা এক হস্তিনী শুঁড়ে করে ফুলের মালা এনে তাঁর গলায় পরিয়ে, তাকে পিঠে তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে চলল।

রাজ্যের অমাত্যরা এইভাবে নতুন রাজা খুঁজে আনতে হাতিটিকে পাঠিয়েছিলেন। হাতি রাজশেখরকে পছন্দ করে নিয়ে এল। অমাত্যরা আনন্দিত হয়ে তাঁকেই সিংহাসনে বসালেন। স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে এসে রাজশেখর নতুন রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

ঐ রাজ্যের অনেক শত্রু ছিল। তারা এবার দল বেঁধে রাজধানী ঘিরে ফেলল। রাজশেখরকে সিংহাসন থেকে নামানোই তাদের মতলব।

রাজশেখর তখন রানীর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রানীর বড় ভয়। সবাই বলছে ভোরবেলা শত্রুরা আক্রমণ করবে। কি হবে ? রাজশেখরের মনে এতটুকু ভয় নেই। তিনি বললেন, কি আবার হবে ? দেবতা সহায় হলে কোনো ভয়ের কারণ নেই, আর তিনি বিমুখ হলে, প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হবে না। যখন গৃহহারা হয়ে গাছতলায় বাস করছিলাম, তখন তো আমি কোনো চেষ্টাই করিনি, তবু দেবতাই আমাকে রাজ্য দিলেন। সে রাজ্য যদি এখন নিয়ে নিতে চান, তাই নেবেন। তাঁর হাতেই সব ভার রয়েছে, আমার কিছু করবার নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে পাশার চাল দাও।

কোনো কথাই দেবতার কান এড়িয়ে যায় না। এ-কথাগুলোও তিনি শুনলেন। শুনে ভয়াবহ চেহারা ধরে শত্রুদের সামনে রুখে দাঁড়ালেন। তারা তাই দেখেই রণে ভঙ্গ দিয়ে, যে যেদিকে পারে পালাল।—রাজশেখর জয়ী হলেন।"

গল্প শুনে যোগী বড় খুশি হলেন। খুশি হয়ে তিনি বিক্রমাদিত্যকে

কাশ্মীর থেকে আনা একটি শিবলিঙ্গ দিয়ে বললেন, "মনে মনে যা ভাববেন, এঁর দয়ায় তাই পাবেন। ভক্তিভরে এঁর পূজো করবেন।"

রাজা বললেন, "বেশ তাই হবে।" এই বলে শিবলিঙ্গ নিয়ে সবে রওনা হয়েছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, "আমি রোজ শিবলিঙ্গের পূজো করি, কিন্তু আমারটি হারিয়ে গেছে। তিন দিন পূজো করতে পারিনি, কাজেই উপবাসী আছি। ঐ শিবলিঙ্গটি আমাকে দাও।"

রাজা তখনি তাঁকে শিবলিঙ্গ দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।'

গল্প শেষ করে বিদ্যাবতী বলল, 'আপনি যদি বিক্রমাদিত্যের মতো উদার আর দানশীল হয়ে থাকেন, তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আঠারো

পনেরো দিনের দিন ভোজরাজ সিংহাসনে উঠতে যেতেই, আরেকটি পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম নিরুপমা। আগে আমার কথা শুনুন, তারপর ইচ্ছা হয় তো সিংহাসনে বসবেন।

বিক্রমাদিত্য যখন রাজা ছিলেন, বসুমিত্র বলে তাঁর একজন পুরোহিত ছিলেন। বসুমিত্রের যেমন রূপ তেমনি গুণ। বয়সও বেশি নয়, স্বভাব বড়ই দয়ালু। সব দিক দিয়ে তিনি বড় সুখী ছিলেন। রাজা তাঁকে ভালোবাসতেন। তাছাড়া নিজেও খুবই ধনী ছিলেন।

শাস্ত্রেও আছে আর পণ্ডিতরাও বলেন যে, যত রকম পুণ্য কাজ আছে, তার মধ্যে গঙ্গাস্নান হল সবার সেরা। গঙ্গার জলে মনের সব পাপ আর শরীরের সব গ্লানি ধুয়ে যায়। এই সব কথা মনে করে বসুমিত্র তীর্থে বেরোলেন। বারাণসীতে গিয়ে তিনি গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শন ইত্যাদি পুণ্য কাজ শেষ করে, আবার দেশে ফিরবার জন্যে রওনা হলেন।

মাঝপথে এক নগরে বসুমিত্র অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখলেন। সেই নগরে মন্মথ-সঞ্জীবনী নামে একজন অপ্সরা রাজত্ব করতেন। তিনি অবিবাহিতা। কোনো শাপের ফলে ঐ নগরে বাস করছিলেন।

ঐ নগরে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দির। তার সামনে চমৎকার বিয়ের মণ্ডপ সাজানো ছিল। মন্দিরের দোরগোড়ায় মস্ত কড়াইতে তেল ফুটছিল। সেখানে মেলা লোকের ভিড়; তারা বলাবলি করছিল, যে

বীরপুরুষ ঐ ফুটন্ত তেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন, মন্মথ-সঞ্জীবনী তাঁকেই বিয়ে করবেন। কিন্তু কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

এই সব দেখে বসুমিত্র বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির সকলে আর বন্ধুবান্ধবরা তাকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি। তারপর তিনি গেলেন বিক্রমাদিত্যের কাছে, শ্রদ্ধা জানাতে আর বারাণসী থেকে আনা গঙ্গা জল আর বিশ্বনাথের প্রসাদ দিতে।

রাজা তাঁকে আদর করে বসিয়ে, কুশল শুধিয়ে, শেষে বললেন, "ভালোভাবে তীর্থ শেষ করেছ তো? বিদেশে আশ্চর্য কিছু দেখে থাকলে, আমাকে বল।" তখন বসুমিত্র তাঁকে মন্মথ-সঞ্জীবনীর কথাটা বললেন।

শুনেই বিক্রমাদিত্য উঠে পড়লেন। বসুমিত্রকে নিয়ে সোজা সেই নগরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে গঙ্গাস্নান আর দেব-দর্শন সেরেই, সেই ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আশেপাশে যারা ছিল সবাই হায়-হায় করে উঠল। দেখতে দেখতে রাজার সুন্দর শরীর একটা মাংসপিণ্ডের মতো হয়ে গেল।

খবর পেয়ে ছুটে এসে, মন্মথ-সঞ্জীবনী তার উপর অমৃত ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা আবার তাঁর আগেকার রূপ ফিরে পেলেন।

কিন্তু মন্মথ-সঞ্জীবনী যখন তাঁর গলায় বরমাল্য দিতে গেলেন, রাজা বললেন, "যদি সত্যিই আমাকে সুখী করতে চাও, তাহলে আমার প্রিয়পাত্র এই পুরোহিতকে বিয়ে কর।"

মন্মথ-সঞ্জীবনী তখন বসুমিত্রের গলায় মালা দিলেন।'

গল্প শেষ করে, নিরুপমা বলল, 'মহারাজ, আপনিও যদি ঐ রকম উদার আর ত্যাগী হয়ে থাকেন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

উনিশ

এর পরদিন ভোজরাজকে ষোড়শ পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম হরি-মধ্যা। আমার কিছু বলবার আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য একবার দিগ্বিজয়ে বেরোলেন। একের পর এক রাজাকে হারিয়ে দিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে, তাঁদের আবার

নিজের নিজের সিংহাসনে বসিয়ে দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন। তারপর একদিন দেশে ফিরে, রাজধানীতে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় একজন দৈবজ্ঞ পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, এখনি রাজপুরীতে প্রবেশ করবেন না। সময়টা অশুভ। চারদিন পরে ভালো সময় হবে, তখন ভিতরে যাবেন।"

পণ্ডিতের কথা শুনে বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীকে বললেন, "শহরের বাইরে বাগানের মধ্যে সামিয়ানা করে থাকার ব্যবস্থা করুন।" তাই হল। এদিকে বসন্তকাল এসেছে, গাছে গাছে ফুলের বাহার, পাখির গান। মন্ত্রীর পরামর্শে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হল।

চমৎকার করে সভা সাজানো হল। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আর পুরোহিতেরা এলেন, ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েরা এলেন, শ্রেষ্ঠ নর্তকীরা এলেন। সভার মাঝখানে নবরত্ন বসানো সিংহাসন রাখা হল। লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। বসন্তকালের সবচেয়ে সুন্দর সুগন্ধী ফুলও সাজানো হল। পূজোর জন্য দীপ ধূপ চন্দন কুমকুম কস্তুরী আর যা যা দরকার, সব এল। রাজা ভক্তিভাবে পূজো করলেন।

পূজোর পর ব্রাহ্মণদের, গাইয়েদের, শিল্পীদের, অন্যান্য অতিথিদের আর যত কানা খোঁড়া অন্ধ রুগ্ন এসে জড়ো হয়েছিল, তাদের সবাইকে টাকাকড়ি কাপড়চোপড় দেওয়া হল। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সকলকে রাজা নিজে হাতে করে পান দিলেন।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, "আমার একটি নিবেদন আছে।" রাজা বললেন "কি বলুন।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "তাঁর আটটি ছেলের পর একটি মেয়ে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মেয়ের বিয়ের সময় তার ওজনের সমান সোনা দেবেন। বিয়ের সময় হয়েছে। এমন মেয়ের ওজনের সমান সোনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাতা রাজা বিক্রমাদিত্য ছাড়া আর কে দেবে ?"

রাজা তখনি কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, "ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ের জন্য তার সমান ওজনের সোনা আর যথেষ্ট বাড়তি সোনা দেওয়া হোক।" সোনা পেয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ বিদায় নিলেন। রাজাও শুভ মুহূর্তে রাজধানীর ভিতরে গেলেন।

আপনিও যদি এই রকম দানশীল হন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কুড়ি

পরদিন সকাল হলে, ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠবার জন্য তৈরি হলেন। তখন সপ্তদশ পুতুল বলল, 'আগে আরেকটি গল্প শুনুন, মহারাজ। তারপর ইচ্ছা হলে সিংহাসনে উঠবেন।

শুনুন মহারাজ, সব পুণ্যবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন যিনি দাতা। বিক্রমাদিত্য ছিলেন সব দাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা। তাঁর আরো গুণ ছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীর। ভয়-ডর বলে তাঁর মনে কিছু ছিল না ; ন্যায়ের জন্যে লড়াই করতে বা অত্যাচারিতকে রক্ষা করতে তিনি নিজের প্রাণকে তুচ্ছ মনে করতেন। বিক্রমাদিত্যের জ্ঞান ছিল অপার। তাঁর আরেকটি মহৎ গুণও ছিল, ঐ-সব গুণের জন্য তাঁর এতটুকু অহংকার ছিল না।

একবার অন্য দেশের এক রাজার ভাটরা বিক্রমাদিত্যের গুণগান করেছিলো। তাতে সেই রাজা বলেছিলেন, "কি এমন গুণ আছে বিক্রমাদিত্যের যার জন্য সবাই তাঁর প্রশংসা করে ?" ভাটরা বললেন, "মহারাজ, বিক্রমাদিত্য যেমন জ্ঞানী, তেমনি বীর আর তাঁর পরোপকারের তুলনা হয় না। এই জন্যেই সকলে তাঁর গুণগান করে।"

রাজা ভাবলেন, আমিও ঐ-রকম পরোপকার করব। কিন্তু রোজ রোজ পরোপকার করতে গেলে যে অনেক টাকাকড়ির দরকার, সে আমি কোথায় পাব ? তারপর একজন যোগীকে রাজা বললেন, "আপনি বলে দিন কি উপায়ে অনেক টাকা পেতে পারি।" যোগী বললেন, "ও রকম কোনো উপায় নেই।" রাজা তবু পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

শেষে যোগী বললেন, "যদি অমাবস্যার রাতে চৌষট্টি যোগিনীচক্রের পূজো করে. আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের শরীর আহুতি দেন, তাহলে যোগিনীচক্র প্রসন্ন হয়ে আপনাকে নতুন দেহ দান করে, বর দিতে চাইবেন। আপনি তখন বলবেন, রোজ যেন আপনার সাতটি বিশাল কলসি সোনায় ভরে যায়, যাতে তাই দিয়ে আপনি পরোপকার করতে পারেন !"

যোগিনীরা কিন্তু বলবেন, "তাহলে তিন মাস ধরে রোজ আপনাকে

নিজের দেহ আহুতি দিতে হবে, তবেই আপনি যা চাইছেন, তাই পাবেন।”

সেই ব্যবস্থাই করলেন রাজা, রোজ নিজের দেহ আগুনে দিতে প্রস্তুত হলেন। কথাটা বিক্রমাদিত্যের কানে যাবামাত্র তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে, পূর্ণাহুতির সময় রাজার বদলে নিজে আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

যোগিনীরা তখনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে, জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কেন এ কাজ করলে ?” বিক্রমাদিত্য বললেন, “পরোপকারের জন্য।”

তাঁরা বললেন, “আমরা প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।” বিক্রমাদিত্য বললেন, “তাহলে এই রাজাকে রোজ এ-ভাবে কষ্ট পেতে যেন না হয়। এঁর সাতটি কলসি এমনিই রোজ ভরে দিন।” তাঁরা বললেন, “তাই হবে।” বিক্রমাদিত্যও তখন নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

আপনিও কি পারতেন এইভাবে নিজের প্রাণ দিতে, মহারাজ ? তাহলে সিংহাসনে বসুন।’

সেদিনও ভোজরাজের সিংহাসনে বসা হল না।

একুশ

আঠারো দিনের দিনও একটি পুতুল ভোজরাজের সিংহাসনে ওঠায় বাধা দিয়ে বলল, ‘মহারাজ, আমার নাম বিলাস-রসিকা। শুনুন আমার কথা।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সময় মণিপুরে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। নীতিশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ছেলেকে উনি যখন শিক্ষা দিতেন, আমিও শুনতাম।

তিনি বলতেন, মন্দ লোকের সঙ্গে কখনও মিশো না। মন্দ লোকের সঙ্গে থাকলে, ভালো লোকেরও নিন্দা হয়। তা ছাড়া খারাপ দৃষ্টান্ত দেখে দেখে মনের বিনয় আর সততাও ক্রমে কমে আসে। সাধু লোকের সঙ্গে মিশতে পারাও সৌভাগ্য। চন্দনের মতো তাতে মন শান্ত হয়, মন্দ চিন্তা দূর হয়।

আরো বলতেন পণ্ডিত, কারো সঙ্গে শত্রুতা করো না। মিছিমিছি চাকরবাকরকে বকাবকি করো না। খুব বেশি অন্যায় না করলে কোনো মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িও না। রোজ কিছু দানধ্যান আর পড়াশুনা করবে। মা-বাপের সেবা করবে। নিষ্ঠুর কথা বলে কারো মনে কষ্ট দেবে

না। আর লোক-দেখানি জাঁকজমক করবে না।

মহারাজ, রাজা বিক্রমাদিত্য এই সব নিয়ম মেনে চলতেন। একবার এক বিদেশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সারা পৃথিবী ঘুরে এলে, কোথাও আশ্চর্য কিছু দেখেছ?"

সে বলল, "তাও দেখেছি, মহারাজ। উদয়াচলে সূর্যদেবের বিশাল মন্দির আছে। গঙ্গার ধারে পাপবিনাশন নামে একটি মন্দির দেখলাম। সেখানে গঙ্গা থেকে রোজ একটি করে সোনার থাম ওঠে। থামের মাথায় একটা রত্ন বসানো সিংহাসন। থাম উঁচু হতে হতে একেবারে সূর্যের কাছে পৌঁছয়। তারপর সূর্য যেমন পশ্চিমে হেলে যায়, থামটিও ছোট হতে হতে, শেষে গঙ্গায় ডুবে যায়।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "চল, আমাকেও দেখাও।" যেমন কথা তেমনি কাজ। দুজনে অনেক পথ পার হয়ে রাতে সেখানে পৌঁছলেন। সকাল বেলা রাজা দেখলেন, গঙ্গার বুক থেকে সত্যি সত্যি এক সোনার থাম উঠেছে। তার মাথায় চমৎকার এক সিংহাসন।

এক লাফে বিক্রমাদিত্য সেই সিংহাসনে চড়ে বসলেন। তাঁকে নিয়ে থাম ক্রমাগত উঠতে লাগল। শেষ যখন উঠতে উঠতে সূর্যের খুব কাছে পৌঁছল, সূর্যের ভীষণ তেজে রাজার শরীর একটা মাংসপিণ্ডের মত হয়ে গেল। সেই অবস্থাতেই রাজা সূর্যদেবের স্তব করতে লাগলেন। সূর্য থেকেই সব প্রাণের উদয়। সূর্যই তাদের বাঁচিয়ে রাখেন। আবার সূর্যের তেজেই তাদের শেষ হয়। সেই সূর্যকে প্রণাম। রাজারও দেহ পুড়ে গেল। কিন্তু সূর্যদেব অমৃত ছিটিয়ে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলে বললেন, "যেখানে কেউ আসতে পারে না, প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তুমি সেখানে এসেছ। বর চাও।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "যেখানে মুনিরাও আসতে পারেন না, আমি যে সেখানে আসতে পেরেছি, সে-ই আমার যথেষ্ট। এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে? প্রভু, আমার সব আছে, চাইবার কিছু নেই।"

তবু সূর্যদেব তাঁকে নিজের নবরত্ন বসানো কানের কুণ্ডল দিয়ে বললেন, "এ যার কাছে থাকবে সে রোজ এক ভার সোনা পাবে।"

সূর্যদেবকে প্রণাম করে, কুণ্ডল দিয়ে বিক্রমাদিত্য আবার উজ্জয়িনীতে

ফিরে এলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "আমি এত গরীব যে বাড়ির লোকদের পেট ভরে খাওয়াতে পারি না।" রাজা অমনি তাঁকে কুণ্ডল দুটি দিয়ে বললেন, "এ দুটি থাকলে, রোজ এক ভার সোনা পাবেন, দুঃখ কষ্ট দূর হবে।" '

গল্প শেষ করে বিশাল-রসিকা বলল, 'মহারাজ আপনিও যদি এই রকম উদার হয়ে থাকেন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ মাথা নিচু করে রইলেন।

বাইশ

তার পরদিন উনিশ সংখ্যার পুতুল ভোজরাজকে বাধা দিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার নাম শৃঙ্গার-কলিকা। বিক্রমাদিত্যের বিষয়ে একটা গল্প বলি শুনুন।'

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্ত রাজ্যের রাজকুমারদের নিয়ে নানা রকম আলাপ করছেন, এমন সময় একজন শিকারী এসে খবর দিল, "মহারাজ, বনের মধ্যে একটা পর্বতের মতো প্রকাণ্ড বরাহ দেখে এলাম। সেটা একটা কুঞ্জবনে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।"

এমন মনের মতো কথা শুনে, তখনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সামন্ত রাজকুমারদের সঙ্গে রাজা ঐ বনে গেলেন। তাঁদের ঘোড়ার খুরের শব্দ আর অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে ভীষণ রেগে, কুঞ্জবন থেকে বেরিয়ে সেই বরাহ ওদের দিকে তেড়ে গেল। বিক্রমাদিত্য তাঁর ছাব্বিশটি বাণ মারলেন। বাণ লাগলও বরাহের গায়ে। কিন্তু পড়ে যাওয়া দূরে থাক, সে অস্ত্র গ্রাহ্য না করে, পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্যও ঘোড়া থেকে নেমে গুহায় ঢুকলেন। দেখলেন সামনে এক সোনার দরজা। রাজা ভিতরে গেলেন। সেখানে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাজা নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর যেতেই অন্ধকারের বদলে উজ্জ্বল আলো দেখলেন।

সেই আলোতে দেখা গেল সোনার পাঁচিলে ঘেরা চমৎকার এক নগর। চওড়া পথ, সুন্দর বাগান, মন্দির, প্রাসাদ। দোকান-পাট দেখেই বোঝা গেল এ নগরে শৌখীন লোকদের বাস।

কৌতূহলী হয়ে রাজা একটা দোকানে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ চোখে

পড়ল সামনে চমৎকার রাজবাড়ি। রাজা সেখানে গেলেন। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচন, বিরোচনের ছেলে বলিরাজা। তিনি এই নগরে রাজত্ব করতেন। বিক্রমাদিত্যকে তিনি ভারি শ্রদ্ধা করতেন।

হঠাৎ তাঁকে দেখে বলিরাজা আহ্লাদে আটখানা। "প্রভু! আপনি হঠাৎ এখানে?"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "আপনাকে দেখতে এসেছি, আর কোনো কারণে নয়।"

বলিরাজা বললেন, "শুধু বন্ধুত্বের কারণেই যদি এসে থাকেন তাহলে আমার কাছ থেকে কোনো উপহার নিন। শাস্ত্রে বলে তাতে আমারই পুণ্য হবে। কি দেব, বলুন।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "কি চাইব ভাই? আমার ঘর জিনিসপত্রে ঠাসা। আমার তো কোনো কিছুর দরকার নেই।"

বলিরাজ কিছুতেই ছাড়লেন না।

"দরকার না থাকলেও, না হয় অ-দরকারি কিছুই দিলাম।" এই বলে তাঁকে রস আর রসায়ন বলে দুটি আশ্চর্য জিনিস দিলেন। এর পর বলিরাজকে তাঁর প্রীতি জানিয়ে, বিক্রমাদিত্য গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে ঘোড়ায় চড়ে কিছুদূর এগোতেই, এক গরীব ব্রাহ্মণ আর তাঁর ছেলে কাছে এলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "আমরা খেতে পাই না, মহারাজ আপনি যা হয় ব্যবস্থা করুন।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "আমার কাছে এখন টাকাকড়ি নেই কিন্তু। দুটি আশ্চর্য জিনিস আছে। কোন্‌টি নেবেন বলুন। এই যে রস, এটি কোন ধাতুতে লাগলে, সে ধাতু সোনা হয়ে যায়। আর এই যে রসায়ন, এটি খেলে কেউ বুড়োও হয় না, মরেও না। কোন্‌টি দেব?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "রসায়নই ভালো। তাহলে বুড়োও হব না, মরবও না।" ছেলের কিন্তু অন্য মত। "সেই গরীবই যদি রইলাম, তাহলে চির-কাল বেঁচে কি হবে? রসই ভালো।"

তাঁদের কথা শুনে বিক্রমাদিত্য রস আর রসায়ন দুই-ই দান করলেন।

আপনিও কি এই রকম উদার দাতা, মহারাজ? তাহলে সিংহাসনে উঠুন।'

উঠলেন না ভোজরাজ, সরে গেলেন।

তেইশ

পরদিন বিংশ পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'মহারাজ, সিংহাসনে বসবার আগে আমার কথা শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বছরের ছ মাস উজ্জয়িনী থেকে রাজ্য চালাতেন। বাকি ছ মাস একলা ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে, কোথায় কি ঘটছে দেখে বেড়াতেন।

এই রকম একবার নানা দেশ বেড়িয়ে এক অচেনা শহরের বাইরে পৌছলেন। সেখানে বিশাল এক বাগান। বাগানে চমৎকার প্রকাণ্ড পুকুর দেখলেন। টলটল করছে জল; সুন্দর করে ঘাট বাঁধানো। রাজা হাত মুখ ধুয়ে, জল খেয়ে চারদিকের শোভা দেখবার জন্য ঘাটের সিঁড়িতে বসলেন।

ক্রমে আরো অনেক বিদেশী ভ্রমণকারী সেখানে এসে, জল খেয়ে ঘাটে বসলেন। যেমন হয়ে থাকে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, "এত দেশ দেখলাম, এত নদী নালা পার হলাম, দুর্গম পাহাড়ে চড়লাম, কিন্তু সে রকম মহাপুরুষ কোথাও দেখলাম না।" আরেকজন বললেন, "সে রকম মহাপুরুষ কি এতই সস্তা যে যেখানে-সেখানে দেখা যাবে? আছেন একজন সত্যিকার মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছনোই এক বিপজ্জনক ব্যাপার। এমন কি প্রাণটাও যেতে পারে। দেখুন, পৃথিবীতে শরীরের বাড়া কিছুই নেই। শরীরটা থাকলে তো তাই দিয়ে অনেক পুণ্য কাজ করা যায়। শরীর গেল তো সব গেল। একে খাড়া পাহাড়, একবার পা হড়কালে আর দেখতে হবে না। তার ওপর বিকট সব হিংস্র জানোয়ারের বাস। জেনে শুনে কে যাবে সেখানে?"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "আমি যাব। সাহস থাকলে কোনো বিপদই বিপদ নয়। আমি সব বিপদ কাটিয়ে সেই মহাপুরুষের কাছে যাব।"

এ-কথা শুনে অন্য যাত্রীরা বললেন, "তাহলে আমরাও যাব। আমাদের নিয়ে চলুন।" রাজা বললেন, "স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।"

হাঁটতে হাঁটতে সবাই হয়রান হয়ে গেলেন। তবু রাজা বলেন, "আরো আট যোজন পথ বাকি।" কোনোমতে তার ছ যোজন পার হবার পর, বিকট বিশাল এক সাপ তাঁদের পথ আটকাল। এত বড় হাঁ কেউ কখনো দেখেনি। তার ভিতর থেকে বিষাক্ত আগুন বেরুচ্ছে।

এই দেখেই ভয়ের চোটে, অন্য সমস্ত যাত্রীরা ফিরে দৌড় দিলেন। বিক্রমাদিত্য একা এগিয়ে গেলেন। তখন সেই সাপটা তাঁকে জড়িয়ে ধরে, ছোবল দিল। বিষে তাঁর সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। তবু তিনি সাপটাকে নিয়েই পাহাড় চড়তে লাগলেন।

এক সময়ে পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছে, ত্রিকালনাথ যোগীকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। বিষের জ্বালাও দূর হল। বিক্রমাদিত্য যোগীকে প্রণাম করলেন।

তখন যোগী জিজ্ঞাসা করলেন, "সব মানুষ যেখানে আসতে ভয় পায়, সেই বিপদে-ভরা জায়গায় তুমি কেন এসেছ, বল।"

রাজা বললেন, "আপনাকে দেখতে এসেছি।"

যোগী বললেন, "তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে।"

"সে কষ্ট স্বীকার করে আমি ধন্য।"

যোগী বড় খুশি হলেন। রাজাকে তিনি তিনটি জিনিস উপহার দিলেন। একটা ঘুঁটি, একটা ডাণ্ডা আর একটা কাঁথা। ঘুঁটি দিয়ে মাটিতে যতগুলো দাগ কাটা যায়, তত যোজন পথ পার হওয়া যায়। ডান হাতে ডাণ্ডা ধরে মরা সৈনিককে ছুঁলে, সে বেঁচে ওঠে। বাঁ হাতে ডাণ্ডা ছুঁলে শত্রুদের সৈন্য ধ্বংস হয়। কাঁথার কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

রাজা তো এই তিনটি আশ্চর্য জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় দেখেন, পথের ধারে একজন রাজপুত্র চিতার কাঠ জড়ো করছে। রাজা বললেন, "এ কি করছ?"

সে বলল, "আমার আত্মীয়রা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে আমি বাঁচতে পারব না, তাই আগুনে ঝাঁপ

দিয়ে মরব ।”

রাজা তাকে বললেন, “ও-সব কিছুই করতে হবে না। তুমি এই তিনটি জিনিস নিয়ে এখনি তোমার রাজ্য উদ্ধার করে, সারা জীবন সুখে থেকো।”

এই বলে জিনিসগুলির গুণ বুঝিয়ে তার হাতে দিয়ে, বিক্রমাদিত্য বাড়ি ফিরে এলেন।

এত সাহস, এত দয়া, এত ত্যাগ আছে আপনার, মহারাজ ? তাহলে সিংহাসনে বসুন।’

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চব্বিশ

রাত গিয়ে আবার সকাল হলে ভোজরাজ আরেকবার সিংহাসনের কাছে এলেন। তখন একুশ সংখ্যার পুতুল বলল, ‘মহারাজ, আমার নাম রতি-লীলা। আমি একটি গল্প বলি শুনুন।

বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসিন্ধু নামে এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর ছেলের নাম অনর্গল। সে বড় দুরন্ত ছিল। বাড়িতে ভালোমন্দ খেয়ে সারাদিন খেলা করে বেড়াত। পড়াশুনোর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না। বাপ অনেক চেষ্টা করেও তার মতিগতি ফেরাতে পারলেন না। শেষে একদিন মনের দুঃখে বললেন, “যার ঘরে ছেলে নেই, তার ঘর শূন্য। যে-দেশে বন্ধু নেই, সে-দেশ শূন্য। যার বিদ্যা নেই, তার হৃদয় শূন্য। কিন্তু মূর্খ ছেলে নেই-ছেলের চেয়েও মন্দ। এমন ছেলে থেকেই বা কি লাভ ?”

এমন কঠিন কথা শুনে অনর্গলের বড় দুঃখ হল। সে ঠিক করল, অন্য দেশে গিয়ে লেখাপড়া শিখে তবে বাড়ি ফিরবে, নইলে এই শেষ। এই ভেবে ভিন্ দেশে গিয়ে অনর্গল এক মহা পণ্ডিতের কাছে নীতি-শাস্ত্র শিখে, একদিন দেশের পথ ধরল।

ফিরবার পথে দেখল বনের মধ্যে মন্দির; মন্দিরের পাশে সুন্দর সরোবর। তার একদিকে পদ্মফুল ফুটেছে, চখা চখী চরছে, কিন্তু অন্য দিকের জল টগবগ করে ফুটছে। এই সব দেখতে দেখতে সূর্য ডুবল, রাত নামল।

তখন জল থেকে আটজন সুন্দর মেয়ে উঠে এসে মহা ঘটা করে

মন্দিরে পূজো দিলেন। তারপর সারা রাত দেবতার সামনে নাচ-গান করে ভোরবেলায় চলে যাবার সময়, তাঁরা অনর্গলকে দেখতে পেলেন। তাঁরা ওকে ডাকলেন, "এসো, আমাদের সঙ্গে।" এই বলে ফুটন্ত জলে ডুব দিলেন। অনর্গলের সাহসে কুলোল না।

দেশে ফিরে এসে অনর্গল রাজা বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করতে গেল। রাজা বললেন, "এত দিন কোথায় ছিলে?" সে বললে, "বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শিখছিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে আশ্চর্য কিছু দেখনি?" তখন অনর্গল সেই গরম জলের পুকুরের কথা বলল। এমন অদ্ভুত কথা শুনে, বিক্রমাদিত্য অনর্গলের সঙ্গে সেখানে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা পৌঁছলেন। মাঝরাতে সেই আটজন মেয়ে জল থেকে উঠে পূজো দিয়ে নাচ-গান করে; ভোরে চলে যাবার সময় রাজাকে দেখতে পেলে, তাঁদের একজন বললেন, "আসুন আমাদের সঙ্গে।" রাজাও অমনি গরম জলে ডুব দিলেন।

জলের তলার সপ্ত-পাতালে তাঁদের বাড়ি। তাঁরা রাজাকে পরম আদরে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আপনি এই রাজ্যের রাজা হয়ে, এখানে থাকুন।" বিক্রমাদিত্য বললেন, "তা তো হয় না। আমার নিজের রাজ্য আছে। আমি খালি এ জায়গাটি দেখতে এসেছি। আপনারা কে?"

তাঁরা বললেন, "আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধি। আপনার উপর আমরা খুশি হয়েছি, বর নিন।"

রাজা বললেন, "তাহলে আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধিই দিন।"

তাঁরা তাঁকে আটটি মণি দিলেন। সে মণির নানান আশ্চর্য গুণ। রাজা রত্ন নিয়ে দেশে ফিরছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি বড়ই গরীব। স্ত্রীর গঞ্জনা সইতে না পেরে বিদেশে এসেছি। যদি কিছু উপায় করতে পারি। যার টাকা নেই, কারো কাছে সে আদর পায় না।"

রাজা তখনি তাঁকে আটটি মণিই দান করে, অনর্গলের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

মহারাজ, আপনারও যদি এই রকম সাহস আর ঔদার্য থাকে, সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ মাথা নিচু করে রইলেন।

পঁচিশ

বাইশ দিনের দিন ভোজরাজ সিংহাসনে উঠতে যেতেই আরেকটি পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম মদনবতী। আমার কিছু বলবার আছে।

আপনি তো শুনেইছেন যে বিক্রমাদিত্য মাঝে মাঝেই পৃথিবীময় ভ্রমণ করতেন। কত তীর্থ, মন্দির, নদী, পর্বত, ঘন বন দেখে একবার তিনি এক আশ্চর্য নগরের কাছে পৌঁছলেন। তার চারদিকে উঁচু সোনার দেয়াল, তার উপর দিয়ে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের বাইরে, শ্রীহরির একটি মন্দির।

সরোবরে স্নান করে, বিক্রমাদিত্য এই বলে শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন, "প্রভু, তোমাকে জানবার ক্ষমতা আমার নেই, তুমি বাক্য-মনের অতীত। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না, আর কারো উপাসনা করি না, কারো কথা চিন্তাও করি না। আমাকে তোমার দাসানুদাস করে রাখ, শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি।"

স্তব হয়ে গেলে, রাজা বাইরের মণ্ডপে এসে বসেছেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এলেন। তিনি বললেন, "আমি একজন তীর্থযাত্রী, সমস্ত পৃথিবী ঘুরছি।" রাজা বললেন, "আমিও তাই।"

তাতে ব্রাহ্মণ আপত্তি করলেন, "তা তো নয়। আপনার সর্বাঙ্গে রাজলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।" রাজা তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনাকে এত ক্লান্ত দেখছি কেন?"

ব্রাহ্মণ তাঁর দুঃখের কথা বললেন, "এখান থেকে কিছু দূরে নীল পর্বত। সেখানে কামাক্ষী দেবীর থান। ঐখানে পাতাল পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ আছে। তার মুখ বন্ধ। কামাক্ষী মন্ত্র জপ করলে শুনেছি ঐ গর্তের মুখ খুলে যায়। দুঃখের বিষয় বারো বছর জপ করেও দেবীকে প্রসন্ন করতে পারলাম না। দরজা খুলল না। ঐ গর্তে একটা রসের উৎস আছে। ঐ রসের এমন গুণ যে অষ্টধাতু লাগালেই সোনা হয়ে যায়।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে নীল-পাহাড়ে দেবীর থানে গিয়ে বিক্রমাদিত্য

দেবীর নাম জপ করে, নিজের গলায় খড়্গ বসাতে যাবেন, এমন সময় দেবী দেখা দিয়ে বললেন, "প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।"

রাজা বললেন, "তাহলে, এই ব্রাহ্মণকে রসকুণ্ড থেকে রস দিন।" দেবী বললেন, "তথাস্তু।" এই বলে গর্তের মুখ খুলে রস এনে দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার গুণগান করতে করতে দেশে ফিরে গেল। রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।'

গল্প শেষ করে মদনবতী বলল 'মহারাজ, আপনি যদি পরের জন্য এতখানি করতে পারেন, তাহলে সিংহাসনে উঠুন।'

রাজা সেদিনও সিংহাসনে উঠলেন না।

ছাব্বিশ

তার পরদিন চিত্রলেখা নামে এক পুতুল ভোজরাজকে বাধা দিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার গল্পটি শুনে তারপর সিংহাসনে বসবেন।

বিক্রমাদিত্য পৃথিবী ভ্রমণ করে একবার রাজধানীতে ফিরে এসে সে দিনটি কি ভাবে কাটিয়েছিলেন, আগে সে-কথা শুনুন। রাজবাড়িতে এসে প্রথমে স্নান করে পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে দেবমন্দিরে গিয়ে ভক্তিভরে দেবতার স্তব করলেন, "প্রভু, তুমিই মা-বাবা, ভাই-বন্ধু; তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন-সম্পদ : তোমাকে ছাড়া কিছু নেই।"

তারপর গরীব দুঃখী কানা খোঁড়া অন্ধ আতুরকে প্রচুর দান করে খাবার জায়গায় গেলেন। সেখানে ছোটদের, বুড়োদের, মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেলে পর, বন্ধুদের নিয়ে খেতে বসলেন। এই ভাবে খাওয়ার কথা শাস্ত্রেই লেখা আছে।

খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে শাস্ত্রে আরো লেখা আছে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে বেশি জল খেও না, খুব বেশি খেও না, দিনে ঘুমিও না, রাতে জেগো না।

খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, বিক্রমাদিত্য রাজকার্যে মন দিলেন। আরো রাত হলে খেয়েদেয়ে শুতে গেলেন।

চাঁদের আলোর মতো সাদা বিছানা, তার ওপর নানা রকম সুগন্ধী সাদা ফুল ছড়ানো। রাজা খুব আরামে ঘুমোলেন, কিন্তু শেষ রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে, ভগবানের নাম মুখে নিয়ে উঠে বসলেন। পরে স্নান

করে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে সভায় গেলেন।

সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ছিলেন। রাজা তাঁদের বললেন, "কাল শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছি আমি মাহষের পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। এর মানে কি হতে পারে?"

পণ্ডিতরা বললেন, "হাতি চড়া, কি বাড়ির উপর তলায় ওঠা, কান্না, মরা, ছাতা, চামর, সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, লক্ষ্মী স্ত্রী, শাঁখা বা সোনা —এসবের স্বপ্ন দেখলে ভালো হয়। কিন্তু মহিষ, গাধা, কাঁটা গাছে চড়া; ছাই, কার্পাস, ধোঁয়া, বাঘ, সাপ, বরাহ, বাঁদর—এসবের স্বপ্ন দেখা খুব খারাপ।"

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করলে এর ফল দূর করা যায়?"

তাঁরা বললেন, "দান করে। স্নান আর যজ্ঞের পর ব্রাহ্মণদের কাপড় গয়না দেবেন। তাছাড়া গরু দান করবেন। কানা খোঁড়া কালা বোবা অনাথ—এদেরও যথেষ্ট দান করুন। এ সব করলে, ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে আপনার অমঙ্গল কেটে যাবে।"

এই কথা শুনে রাজা তিনদিন ধরে পূজো, যজ্ঞ আর দান করলেন। ভাণ্ডারীকে বললেন, "সকলে, যাতে খুশি হয়ে বাড়ি যায়, এত টাকাকড়ি দিও।"

গল্প শেষ করে চিত্রলেখা বলল, 'মহারাজ, আপনিও যদি এই রকম দাতা হন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাতাশ

চব্বিশ দিনের সকালে ভোজরাজ আরেকবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করতেই, সুভগা নামে পুতুল বলল, 'মহারাজ, আগে আমার কথা শুনুন।'

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে পুরন্দর বলে এক গ্রামে একজন ধনী বণিক ছিলেন। মারা যাবার আগে তিনি তাঁর চার ছেলেকে ডেকে বললেন, "একসঙ্গে থাকলে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে। তাই আলাদা থাকাই ভালো। আমার খাটের নিচে আমি আমার সম্পত্তি চার ভাগ করে

চারজনের নামে রেখে গেলাম। তোমরা যে যার ভাগ নিও।”

বাবা মারা গেলে ওরা এক মাস একসঙ্গে ছিল, তারপর বৌয়ে বৌয়ে এত ঝগড়া বাধল যে ভাইরা ঠিক করল বাবার কথামতো যে যার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আলাদা থাকাই ভালো। কাজেই খাটের নিচেকার মাটি খোঁড়া হল। খুঁড়তেই চারটি হাঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। হাঁড়ি খুলে দেখা গেল প্রথমটিতে একটু মাটি ; দ্বিতীয়টিতে একটু ঘাস : তৃতীয়-টিতে কয়েকটা হাড় ; চতুর্থটিতে এক টুকরো কয়লা ছাড়া কিছু নেই।

এ কি রকম ভাগ হল ভেবে না পেয়ে, ওরা বুদ্ধির জন্য রাজসভায় গেল। সেখানে কেউ কিছু বলতে পারল না। তখন ওরা অন্য শহরের সদাগর বণিকদের পরামর্শ চাইতে লাগল। কথাটা চারদিকে রটে গেল। সেই সময়ে প্রতিষ্ঠা নগরের রাজা শালিবাহন এক কুমোরের বাড়িতে এসেছিলেন। কথাটা তাঁর কানে গেল।

শালিবাহন বললেন, “এ তো খুব সহজ কথা। প্রথম কলসিতে মাটি, অর্থাৎ বড় ছেলে বাপের জমিজমা পাবে। দ্বিতীয় কলসিতে ঘাস, অর্থাৎ মেজ ছেলে সব শস্যক্ষেত পাবে। তৃতীয় কলসিতে হাড়, অর্থাৎ সেজ ছেলে সব গোরু ছাগল আর অন্য পশু পাবে। চতুর্থ কলসিতে কয়লা, তার মানে ছোট ছেলে সব সোনারূপো পাবে।”

কুমোরের কাছে এই কথা শুনে চার ভাই খুশি হয়ে বাড়ি গেল। খবরটা বিক্রমাদিত্যও শুনলেন। তিনি শালিবাহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে উজ্জয়িনীতে ডেকে পাঠালেন। শালিবাহন বড় অহংকারী। তিনি চিঠি পেয়ে বললেন, “এ লোকটি কে? আমাকে ডেকে পাঠালেই সেখানে যেতে হবে? সে নিজে এলেও বুঝতাম। তার কাছে যাবার কোনো দরকার দেখি না।”

এই রকম দাম্ভিক উত্তর পেয়ে, ভীষণ রেগেমেগে বিক্রমাদিত্য বিশাল সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, হাতি-ঘোড়া, দামামা-তূরী-ভেরী নিয়ে প্রতিষ্ঠানগর আক্রমণ করলেন। শেষনাগের ছেলে শালিবাহনের নানা রকম দৈব-শক্তি ছিল। তিনি অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে, কয়েকটা মাটির হাতি ঘোড়া সৈনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে, তার উপর ফুঁ দিতেই, সেগুলো জ্যান্ত হয়ে, বিশাল এক সৈন্যবাহিনী হয়ে গেল।

সেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের সৈন্য ভীষণ লড়াই করল। হেরেই যেত শালিবাহনের দল। বেশীর ভাগই প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি শেষনাগকে ডাকলেন। শেষনাগ ছেলের সাহায্যে এলেন। লক্ষ লক্ষ বিষাক্ত সাপ যুদ্ধক্ষেত্রে কিলবিল করতে লাগল। তারা বিক্রমাদিত্যের হাতি ঘোড়া সৈনিক সবাইকে কামড়ে বিষে জর্জরিত করে ফেলল। ফলে বিক্রমাদিত্যের লোকজন সবাই অজ্ঞান হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইলেন।

ক্ষোভে, অপমানে বিক্রমাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গিয়ে, নয় বৎসর ধরে নিজের আধখানা শরীর জলে ডুবিয়ে রেখে, বাসুকি মন্ত্র জপ করলেন। অবশেষে বাসুকির দয়া হল। তিনি বিক্রমাদিত্যকে এক ভাঁড় অমৃত দিলেন। ঐ অমৃত ছিটিয়ে তাঁর সৈনিকদের যাতে আবার জীবন দান করতে পারেন। অমৃত নিয়ে বিক্রমাদিত্য ফিরে আসছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি প্রতিষ্ঠানগর থেকে আসছি। আমাকে একটা জিনিস দিন।" রাজা বললেন, "কি জিনিস বলুন, আমি দেব।"

"তাহলে ঐ অমৃতভাণ্ডটি দিন।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "আপনাকে কে পাঠিয়েছে ?"

"আমাকে শালিবাহন রাজা পাঠিয়েছেন।" বিক্রমাদিত্য তখনি তাঁর হাতে অমৃতের ভাঁড়টি দিয়ে, রাজধানীতে ফিরে গেলেন।'

তারপর সুভগা বলল, 'এতখানি ক্ষমা করতে, এত দান করতে যদি আপনিও পারেন, তাহলে সিংহাসনে উঠুন।'

ভোজরাজ সিংহাসনে উঠলেন না।

আঠাশ

পঁচিশ দিনের সকালে, প্রিয়দর্শনা নামে এক পুতুল বলল, 'মহারাজ, আগে আমি কিছু বলি, শুনুন।

একদিন এক জ্যোতিষী বিক্রমাদিত্যের সভায় এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "সূর্য আপনাকে বীরত্ব, চন্দ্র ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল সুমঙ্গল, বুধ বুদ্ধি, বৃহস্পতি গুরুর গুণ, শুক্র পুত্র, শনি কল্যাণ, রাহু বাহুবল আর কেতু বংশের উন্নতি দান করুন।"

পরে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি দৈবজ্ঞ, তাহলে বলুন নবগ্রহের মধ্যে এ বছর কে রাজা কে মন্ত্রী, ইত্যাদি।" জ্যোতিষী বললেন, "এ বছর সূর্য রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী এবং মেঘের অধিপতি। শনিগ্রহ রোহিণী শকট ভেদ করে যাবেন। এই সব হলে দারুণ অনাবৃষ্টি হয়। বরাহমিহির লিখেছেন এমন হলে সমুদ্রও শুকিয়ে যায়, সমস্ত লোক বিনাশ হয়।"

রাজা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "কোন উপায়ে এই সর্বনাশ বন্ধ করা যায় না?"

জ্যোতিষী বললেন, "কেন যাবে না? গ্রহ হোম করলেই বৃষ্টি হবে।"

রাজা তখনি ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের কথামতো হোমের সমস্ত জিনিসপত্র আনালেন। ঘটা করে হোম হল। চাল, কাপড় ইত্যাদি দশ রকম জিনিস দান করলেন। ব্রাহ্মণদের নানারকম উপহার দিলেন। গরীব, রুগ্ন, কানা, খোঁড়া, কালা, বোবা, অনাথ আর সব রকম দুঃখীকে প্রচুর দিয়ে সুখী করলেন।

তবু বৃষ্টি হল না। জলের অভাবে দেশের লোকের ছাতি ফাটে। লোকের দুঃখে দুঃখী রাজা যজ্ঞ ঘরে বসে ভেবে আকুল হলেন। এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল, "যদি বত্রিশ রকম সুলক্ষণযুক্ত কোনো পুরুষের মুণ্ডু কেটে বলি দেওয়া হয়, তাহলে নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃষ্টি দেবেন।

তখুনি বিক্রমাদিত্য মন্দিরে গিয়ে খড়্গ তুলে নিজের গলা কাটতে গেলেন। দেবী তাঁর হাত ধরে ফেলে বললেন, "বাছা, আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর নাও।" রাজা বললেন, "যদি প্রসন্ন হয়ে থাক, মা, তাহলে প্রচুর বৃষ্টি দাও।" দেবী তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি দিলেন। দেশের লোকের প্রাণ বাঁচল, পশু-পাখি বাঁচল, ফসল বাঁচল।'

গল্প শেষ করে প্রিয়দর্শনা বলল, 'মহারাজ, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মতো ধৈর্য আর ত্যাগ থাকে, তাহলে তাঁর সিংহাসনে বসুন।'

রাজা সেদিনও সিংহাসনে বসলেন না।

উনত্রিশ

এইভাবে পঁচিশ দিন কেটে গেলে ছাব্বিশ দিনের সকালে ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন। অমনি কামোন্মাদিনী

নামে পুতুল বলল, 'মহারাজ, বিক্রমাদিত্য কি রকম ধার্মিক আর উদার ছিলেন, সে-কথা শুনুন।

স্বর্গে একবার ইন্দ্রের সভায় নারদমুনি বললেন, "সমস্ত পৃথিবী খুঁড়লেও বিক্রমাদিত্যের মতো গুণী, বীর, পরোপকারী ধার্মিক রাজা আর একটিও পাওয়া যাবে না।"

সেই সভায় অন্য দেবতারা, অপ্সরীরা, মুনি-ঋষিরা, দিক্‌পালরা, সকলেই ছিলেন। ও-কথা শুনে সকলেই ভারি আশ্চর্য হলেন।

ইন্দ্র তখন কামধেনুকে বললেন, "তুমি পৃথিবীতে গিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন গুণী, বীর, পরোপকারী আর ধার্মিক, তা পরীক্ষা করে এসো তো।"

স্বর্গের গোরু কামধেনু সকলের সব ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। তিনি একটা রোগা দুর্বল গোরু সেজে পৃথিবীতে নেমে এলেন।

এদিকে বিক্রমাদিত্য সেদিন বনে বেড়াচ্ছিলেন। বনের এক জায়গায় গভীর কাদা। কামধেনু ইচ্ছা করে সেই কাদায় পড়ে কাতর ভাবে ডাকতে লাগলেন। সে ডাক বিক্রমাদিত্যের কানে যেতেই, তিনি সেই কাদা জলার ধারে ছুটে গেলেন।

গিয়ে দেখলেন একটা রোগা গোরু কাদায় পড়ে আর উঠতে পারছে না। রাজা কাদায় নেমে অনেক চেষ্টা করেও, তাকে তুলতে পারলেন না। এদিকে রাত নেমে এল। চারদিক অন্ধকার হল। তার মধ্যে একটা বাঘও ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। ভয়ের চোটে গোরুটা আরো করুণ ভাবে ডাকতে লাগল।

বিক্রমাদিত্য সারা রাত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোরুটাকে পাহারা দিলেন। বাঘ কিছু করতে পারল না। ভোর হতেই সে আবার বনে চলে গেল।

তখন কামধেনু নিজেই কাদা থেকে উঠে এসে, নিজের স্বর্গীয় রূপ ধরলেন। বিক্রমাদিত্য একেবারে অবাক।

কামধেনু বললেন, "রাজা, তোমার সাহস, দয়া আর অন্য সব গুণ পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বড় খুশি হয়েছি, তুমি কোনো বর চাও।"

রাজা বললেন, "মা, তোমার দয়ায় আমার কোনো অভাব নেই।

আমার চাইবার কিছুই নেই।"

কামধেনু তবু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "রাজা, ভগবান আমাকে গরীব করেছেন। তাই আমি সবাইকে দেখতে পাই, কিন্তু এই গরীব মানুষটাকে কেউ দেখতে পায় না। আমাকে একরকম সিদ্ধপুরুষ বলতে পার। আমি নিজে অদৃশ্য থেকে সমস্ত জগৎ-সংসার দেখি। রাজা, জানই তো ছেলে হলে গৃহস্থের বাড়িতে অশৌচ হয়। তখন তারা ভালো করে খায়দায় না। আমার চিরকেলে জন্মাশৌচ। বলতে পার, তাহলে জন্মাল কে? আমি বলি, যে জন্মাল তার নাম দারিদ্র্য। একমাত্র তুমিই কল্পতরুর মতো আমার দুঃখ দূর করতে পার।"

রাজা তখন কামধেনুটি তাঁকে দিয়ে বললেন, "ইনি কামধেনু। ইনি থাকলে কারো কোনো অভাব থাকে না।" এই বলে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

পারেন মহারাজ, এই রকম দান করতে?'

ভোজরাজ চুপ করে রইলেন।

ত্রিশ

তার পরদিন ভোজরাজ কাছে আসতেই, সুখসাগরা নামে পুতুলটি বলল, 'মহারাজ, আগে বিক্রমাদিত্যের উদার স্বভাবের আরেকটি গল্প শুনুন, তারপর যা হয় করবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য একবার পৃথিবীময় ঘুরতে ঘুরতে এক অচেনা রাজার রাজ্যে এসে পৌঁছলেন। এত ভালো রাজা কম দেখা যায়। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি ধার্মিক আর ন্যায়বান। তাঁর রাজত্বকালে দেশে সকলে সুখে বাস করত। অভাব-অনটন, হিংসা, চুরিচামারি, খুন, জোচ্চুরি, কোনো অন্যায় কাজই ছিল না। প্রজারা সকলেই বড় দয়ালু, আর অতিথি পেলে তো কথাই নেই। তাদের জন্য করতে পারে না এমন কিছু ছিল না।

বিক্রমাদিত্য ঠিক করলেন, এখানে কয়েক দিন কাটাবেন। নগরে একটি সুন্দর দেব-মন্দিরও ছিল। পূজো সেরে, রাজা মন্দিরের নাটমণ্ডপে বসলেন। এখানে নাচ-গান হত। অনেক নগরবাসীও এসে বসলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন চমৎকার চেহারার যুবকের উপর রাজার চোখ পড়ল। যেমন তার রূপ, তেমনি সুন্দর পোশাক আর গয়নাগাঁটি পরা। সে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কিছুক্ষণ হাসি গল্পে কাটিয়ে, তাদের সঙ্গে উঠে গেল। রাজার মনে হল এত সুখী কজনই বা দেখা যায়!

দিন দুই পরে বিক্রমাদিত্য আবার এসে ঐ জায়গায় বসেছেন, এমন সময় সেই সুন্দর যুবকটি আবার এসে দালানে বসল। আজ তার চেহারা দেখে রাজা চমকে উঠলেন। শুকনো মুখ, চোখের নিচে কালি, পরনে একটা খাটো সস্তা কাপড়। তার সমস্ত চেহারায় এমন একটা দুঃখ আর হতাশার ছাপ যে রাজার বড় কষ্ট হল।

তিনি উঠে গিয়ে তার কাছে বসে বললেন, "সে-দিন দেখলাম কি সুন্দর সাজসজ্জা করে, বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করছ। আজ তোমার এ দশা কেন?"

সে বলল, "কি আর বলব! নিজের কর্মফল ছাড়া কাকে দোষ দেব? আমি একজন পেশাদার জুয়াড়ী। পাশা খেলেই আমার দিন চলে। যখন আমার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসে, তখন সেজেগুজে বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করি। আবার যেই পাশা খেলায় হেরে যাই, আমার সব সম্পত্তি বাজি ধরে একে একে সব খোয়াই। তখন পথের ভিখারি হয়ে যাই। আর যে বন্ধুদের কথা বললেন, তারাও একে একে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। ফুলে যখন মধু জমে, তখন শত শত প্রজাপতি আসে, মৌমাছি গুনগুন করে। যেই মধু শুকিয়ে যায়, অমনি তারা অন্য ফুলের কাছে চলে যায়, এদিকে ফিরেও তাকায় না। আজ আমার সেই দশা।"

রাজা বললেন, "তোমাকে তো বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে, তাহলে ঐ সর্বনেশে পাশার নেশা ছাড় না কেন?" যুবক একটু হাসল, "নিজের ব্যবসা কি ছাড়া যায়? পাশাই আমার পেশা। আমি আর কোনো কাজ জানি না। এও আমার পূর্বজন্মের কর্মফল।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "পাশা হল গিয়ে সর্বনাশের সিং-দরজা। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও পাশা খেলতে গিয়ে নিজের, নিজের পরিবারের আর মা-ভাইদের সর্বনাশ করেছিলেন। দেখ, নিজের জুয়া খেলার মোহতে

তো কর্মফল বলে উড়িয়ে দিতে পার না। এই সাংঘাতিক নেশা তুমি ছেড়ে দাও।"

যুবক তাতে অরাজি ছিল না, কিন্তু তাহলে তার চলবে কি করে? রাজা যদি তাকে টাকা রোজগারের অন্য কোনো পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সে পাশা খেলা ছেড়ে দেবে।

ঠিক সেই সময় দুজন বিদেশী ভ্রমণকারী ঐখানে এসে বসলেন, একজন বললেন, "আমি পিশাচলিপি পড়েছি। তাতে লেখা আছে এখান থেকে খানিক দূরে ঈশান কোণে তিন ঘড়া মোহর পোঁতা আছে। ঐ জায়গায় একটি ভৈরব মূর্তি আছে। কেউ যদি নিজের গলার রক্ত দিয়ে ভৈরবের পূজো করে, সে ঐ তিনটি ঘড়ার মালিক হবে।"

রাজা আর অপেক্ষা করলেন না। তখনি সেই ভৈরবমূর্তি খুঁজে বের করে নিজের গলার রক্ত দিয়ে পূজো করলেন। ভৈরব বললেন, "আমি প্রসন্ন হয়েছি। কি বর দেব?"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "এই যুবককে ঘড়া তিনটি দিন।" ভৈরব তাই দিলেন। যুবকও সেদিন থেকে পাশা খেলা ছেড়ে দিল।'

গল্প শেষ করে সুখসাগরা বলল, 'আপনার মধ্যেও যদি এতখানি পরোপকার গুণ:থাকে, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

সেদিনও রাজার সিংহাসনে বসা হল না।

একত্রিশ

আটাশ দিনের সকালে শশিকলা নামে পুতুল বলল, 'আমি একটি গল্প বলি, তারপরে ইচ্ছা হয় সিংহাসনে বসবেন।

একবার ভ্রমণ করতে করতে বিক্রমাদিত্য এক সুন্দর নগরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে নদীর ধারে চমৎকার এক বাগান। সে বাগানে নানা রকম সুগন্ধী ফুল আর মিষ্টি ফলের গাছ শোভা পাচ্ছে। কাকের চোখের মতো পরিষ্কার জলের ধারে অপূর্ব এক দেব-মন্দির।

রাজা স্নান করে, দেব-দর্শন করে, মন্দিরের চালাতে গিয়ে বসলেন। চারজন বিদেশী এসে কাছে বসতেই, বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা এত দেশ বেড়ালেন, কোথাও কোনো আশ্চর্য জিনিস দেখলেন না?"

একজন বললেন, "আমরা এক অপূর্ব দেশ থেকে আসছি। সেখানে বেতালপুর নগরে শোণিতপ্রিয়া বলে একজন ভয়ঙ্কর দেবী আছেন। সেখানকার রাজার আর বড়লোকেদের বিশ্বাস তাঁকে খুশি করতে পারলে তাঁদের ধন-দৌলত আরো বাড়বে। তাই রোজ একজন করে পুরুষকে দেবীর কাছে বলি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ কোনো বিদেশী ওখানে গেলে, তাকেই ধরে বলি দেওয়া হয়। আমরা অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

এই কথা শুনেই রাজা সেই ভয়ঙ্কর বেতালপুর নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মন্দিরে গিয়ে ভয়াবহ চেহারার দেবীর স্তব করলেন। তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। তারপর বাইরে আসতেই দেখলেন এক বেচারি মলিন-মুখ লোককে নগরের মহাজনরা বলির জন্য নিয়ে এসেছে। ভয়ে সে আধমরা হয়ে আছে। রাজার তাই দেখে বড় দয়া হল।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, ওর বদলে আমিই মরি না কেন? শরীর তো কারো চিরদিন থাকবে না। তবে আর এত মায়া কেন? পরকে বাঁচাতে যদি আমার দেহটা দিতে পারি, তার চেয়ে মহৎ কাজ আর কি হতে পারে?

এই ভেবে বিক্রমাদিত্য সেই লোকদের বললেন, "ও লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলি দাও। দেখছ না ও কি রোগা, রুগ্ন চেহারা। আধমরা হয়ে আছে। তার চেয়ে আমার মতো সুস্থ মোটাসোটা বলি পেলে দেবী বেশি খুশি হবেন।"

এই বলে সেই লোকটির বাঁধন খুলে দিয়ে, রাজা দেবীর সামনে গিয়ে খড়্গটা তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবী তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, "বাছা, তোমার স্বার্থত্যাগ দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। কি বর চাও বল।"

রাজা বললেন, "মা, যদি খুশি হয়ে থাক, তাহলে আর নরবলি চেয়ো না। নরবলি বন্ধ করে দাও।"

দেবী বললেন, "তাই হোক।"

তখন নগরের লোকরাও রাজার গুণগান করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

মহারাজ, আপনিও কি এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারেন ? তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

রাজা চুপ করে রইলেন।

বত্রিশ

তার পরদিন উনত্রিশ সংখ্যার পুতুল বলল, 'মহারাজ, আমার নাম চন্দ্ররেখা। আগে বিক্রমাদিত্যের গুণের কথা আরো শুনুন।

একবার বিক্রমাদিত্য সভায় বসেছেন। সামন্ত রাজারা তাঁর গুণগান করছেন। এমন সময় একজন ভাট এসে তাঁর অনন্ত আয়ু কামনা করে বললেন, "মহারাজ, আপনি কল্পতরুর মতো সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন। তাই আমি এসেছি যাতে আমার এই নিদারুণ গরীব অবস্থা দূর হয়। জম্বীরনগরে ধনেশ্বর নামে এক রাজা আছেন। তিনিও বড় দাতা। একবার তিনি বসন্তপূজো করেছিলেন। সেখানে হাজার হাজার বিদেশী এসে জড়ো হয়েছিল। রাজা সে দিন আট কোটি সোনার মোহর দান করেছিলেন। আপনার নিজ রাজ্যে আপনিও সেই রকম দাতা বলে শোনা যায়।"

রাজা ভাটের কথা শুনে ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, "এঁকে রাজ-কোষে নিয়ে যাও। সেখানে যা কিছু ভালো জিনিস আছে ওঁকে দেখাও। ওঁর যা পছন্দ, তাই ওঁকে দিও।"

ভাণ্ডারীর সঙ্গে রাজকোষে গিয়ে ভাট সাধ মিটিয়ে ধনরত্ন সংগ্রহ করলেন। তারপরে রাজার গুণগান করতে করতে বিদায় নিলেন।'

গল্প শেষ করে চন্দ্ররেখা বলল, 'আপনিও যদি তাঁর মতো উদার হয়ে থাকেন, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

তেত্রিশ

তার পরদিন ত্রিংশ পুতুল হংসগামিনী ভোজরাজকে বাধা দিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার কিছু বলার আছে। বিক্রমাদিত্যের গুণের কথা আরো শুনুন।

একবার রাজা সভায় বসেছেন, এমন সময় একজন জাদুকর এসে বলল, "মহারাজ, আপনি ব্রহ্মার মতো চিরজীবী হন। আপনাকে অনেক

জাদুকর অনেক অনেক ইন্দ্রজাল দেখিয়েছে। আপনি নিজেও অনেক বিদ্যা জানেন। এখন আমার ইন্দ্রজাল একবার দেখুন।"

রাজা বললেন, "আজ বড় দেরি করে এসেছ, স্নান-খাওয়ার সময় হয়ে গেল। তুমি বরং কাল সকালে এস।"

জাদুকর সেদিন চলে গেল।

পরদিন রাজা সভায় বসেছেন, এমন সময় কাঁধে খড়্গ নিয়ে লম্বা-চওড়া, ফরসা, দেখতে অতি সুন্দর একজন দাড়িওয়ালা লোক, একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে রাজাকে প্রণাম করল।

রাজা বললেন. "নায়ক, তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

সে বলল, "আমি ইন্দ্রের চাকর। তিনি আমাকে শাপ দিয়েছেন বলে আমি পৃথিবীতে বাস করছি। ইনি আমার স্ত্রী। এদিকে স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ বেধেছে। আমাকে গিয়ে আমার প্রভুর কাছে দাঁড়াতে হবে। শুনেছি বিপদগ্রস্ত মেয়েদের আপনি নিজের বোনের মতো রক্ষা করেন। তাই এঁকে আপনার আশ্রয়ে রেখে যেতে চাই।"

রাজা বললেন, "বেশ, তাই হবে!" সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সে লোকটি নিজের খড়্গের উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়ে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। খালি বিকট মার্ মার্ কাট্, কাট্, শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই খড়্গসুদ্ধ একটা রক্তমাখা হাত রাজার সামনে এসে পড়ল। তার পরেই একটা কাটা মুণ্ডু, তারপর একটা মুণ্ডু ছাড়া ধড়। সেই বীর পুরুষই যে মারা পড়েছে, সে আর চিনতে কারো বাকি রইল না।

নায়কের স্ত্রী রাজার পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, "আমার আর বেঁচে কি লাভ? আমি ওঁর সঙ্গে সহমরণে যাব।" বিক্রমাদিত্য ব্যথিত মনে চন্দন কাঠের চিতা সাজাতে বললেন। সেই চিতায় স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে মেয়েটি পুড়ে মরল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সকলেই দুঃখিত মনে শুতে গেলেন। পরদিন সকালে রাজা আবার সভায় বসেছেন, এমন সময় কি আশ্চর্য! সেই নায়ক এসে হাসিমুখে রাজার গলায় স্বর্গের মান্দার ফুলের মালা পরিয়ে বলল, "যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি, মহারাজ, আমারও পৃথিবী-বাস

ফুরোল। প্রভু স্বর্গে ফিরে যেতে বলেছেন। তাই আমার স্ত্রীকে নিতে এলাম।"

এ-কথা শুনে সকলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। নায়ক বলল, "সবাই চুপ কেন ? কি হয়েছে ?"

রাজা বললেন, "তোমার স্ত্রী আগুনে পুড়ে মরেছে।"

"কেন ?"

কারো মুখে কথা নেই।

তখন নায়ক হেসে বলল, "মহারাজ, আমি সেই জাদুকর। আপনাকে আমার ইন্দ্রজাল দেখালাম। সত্যিই আপনার মতো মহৎ পরোপকারী কেউই হয় না। আপনি ব্রহ্মার মতো চিরজীবী হন।"

ঠিক সেই সময় পাণ্ড্যরাজ্য থেকে রাজকর এল, আট কোটি মোহর, তিরানব্বুই কোটি মুক্তোর ভার, পঞ্চাশটি হাতি, তিনশো ঘোড়া, চারশো দাসী। রাজা বললেন, "এ সমস্তই আমি জাদুকরকে উপহার দিলাম।" আপনিও যদি এত দিতে পারেন, মহারাজ, তাহলে সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ মাথা নিচু করে রইলেন।

চৌত্রিশ

তার পরদিন রসবতী নামে এক পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'আমার গল্প আগে শুনুন মহারাজ, তারপর যদি মনে হয় আপনার বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা আছে, তাহলে বসবেন।

একবার বিক্রমাদিত্য সভায় কাজ করছেন, এমন সময় একজন দিগম্বর যোগী এসে তাঁর হাতে একটি ফল দিয়ে বলল, "আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শ্মশানে হোম করব। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। শ্মশানের কাছে একটা শমীগাছে এক বেতাল থাকে। আপনি কোনো কথা না বলে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবেন।"

রাজা কথা দিলেন। যথা সময়ে তিনি ঐ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে করে যোগীর কাছে নিয়ে চললেন। তখন বেতাল বলল, "গল্প করতে করতে গেলে পথ-কষ্ট দূর হয়, রাজা।" রাজা কথা বললেন

না। বেতাল বলল, "কথা বলা বারণ বুঝি ? বেশ, আমিই গল্প বলছি। শোন—হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যবতী নগরে সুবিচারক নামে রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর ছেলে ময়সেন একবার শিকার করতে গিয়ে, একটা হরিণের পিছনে পিছনে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে, ঘন বনের মধ্যে পৌঁছলেন।

সেখান থেকে রাজধানীতে ফেরার পথে তাঁর বড়ই জল তেষ্টা পেল। কাছেই একটি নদী বয়ে যাচ্ছিল। নদীর ধারে এক ব্রাহ্মণ বসে পূজো করছিলেন।

যুবরাজ তাঁকে বললেন, আমি যতক্ষণ জলপান করি, আমার ঘোড়াটা একটু ধরে রাখুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি কি তোমার খাই-পরি যে ঘোড়া ধরব ?

যুবরাজ রেগে গিয়ে তাঁকে চাবুকের বাড়ি মারলেন। ব্রাহ্মণও রাজার কাছে নালিশ করলেন। রাজা সব শুনে বললেন, ব্রাহ্মণরা হলেন দেবতাদের মতো পূজ্য। কোনো কারণেই তাঁদের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। রাজকুমারকে আমি নির্বাসন দিলাম।

মন্ত্রী ছুটে এলেন, মহারাজ, মহারাজ, রাজকুমার সাবালক হয়েছেন, তাঁকে নির্বাসন দিলে অন্যায় হবে।

রাজা বললেন, তাই বলে ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলা যায় না। নির্বাসন না দিলাম, যে-হাতে রাজকুমার ব্রাহ্মণকে মেরেছিল, সে-হাতটা কেটে ফেলা হোক। বলে নিজেই হাত কাটতে গেলেন।

তখন ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, রাজকুমার না বুঝে অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে অমন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। আমার অনুরোধে তাঁকে ক্ষমা করুন। রাজা ছেলেকে ক্ষমা করলেন। ব্রাহ্মণও সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি গেলেন। বেতাল এই গল্প বলে জিজ্ঞাসা করল, কে বেশি মহৎ, রাজা না ব্রাহ্মণ ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজাই বেশি মহৎ। মৌন ভঙ্গ হল। কাজেই বেতাল আবার শমীবৃক্ষে ফিরে গেল। রাজা তাকে আবার নামালেন। এই কাণ্ড পঁচিশ বার হল। বেতাল পঁচিশটি গল্প বলল। গল্প শেষ হলে বেতাল বলল, রাজা, একটা কথা শোন। ঐ যোগী

তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। ওর কাছে তুমি যেই যাবে, ওর যজ্ঞও আরম্ভ হবে। ও তোমার শরীরের মাংস দিয়ে যজ্ঞ করে অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে চায়। তাই ও তখন তোমাকে বলবে, দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। আর তুমি উপুড় হয়ে শোবে, ও খড়্গ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে। তুমি প্রণাম করো না। ওকে বলো, আমি রাজা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে জানি না। আপনি দেখিয়ে দিন। তারপর ও যেই উপুড় হয়ে শোবে, তুমিই ঐ খড়্গ দিয়ে ওর গলা কেটে ফেলবে।

বেতাল যা যা বলেছিল, সব সেই রকম ঘটল। বিক্রমাদিত্যও বেতালের কথা মতো কাজ করলেন। তখন বেতাল প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইল। রাজা বললেন, আমি ডাকলেই তুমি আমার কাছে এস। আমি আর কিছুই চাই না। বেতাল তাতে রাজী হয়ে চলে গেল।"'

গল্প শেষ করে রসবতী বলল, 'আপনারও যদি এত ধৈর্য, এত সাহস থাকে, তাহলে আপনার এ সিংহাসনে বসার অধিকার আছে।'

ভোজরাজ সেদিন সিংহাসনে বসলেন না।

পঁয়ত্রিশ

একত্রিশ দিন কেটে গিয়েছিল। আর একটি মাত্র পুতুল বাকি ছিল। তার নাম উন্মাদিনী। সে এবার ভোজরাজকে সব কথা বুঝিয়ে বলল।

শেষ পুতুল বলল, 'রাজা, আসল কথা হল বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসবার যোগ্য, এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। বিক্রমাদিত্য কাঠের খড়্গ হাতে করে পৃথিবীর সব রাজাকে পরাজিত করে, একটি মাত্র নিখুঁত নিষ্পাপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে রাজ্যে কারো কোনো দুঃখ-কষ্ট ছিল না। কোনো অন্যায়কারী সেখানে পার পেত না। সে রাজ্য ছিল ধর্মের রাজ্য। সে রকম রাজ্য, সে রকম রাজা আর তো হয়নি। কাজেই তাঁর সিংহাসনে বসবার অধিকারও কারো নেই। তবে আপনি যদি মনে করেন আপনি তাঁর সমান গুণী, তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।'

ভোজরাজ মাথা নিচু করে সরে দাঁড়ালেন। উন্মাদিনী তখন বলল, 'রাজা, আপনিও কম যান না। আপনার চরিত্রও মহৎ আর নিষ্পাপ। আপনিও জ্ঞানী, গুণী, ধার্মিক, উদার আর সাহসী। আপনাকে এই সব

গল্প বলতে পেরেই আমরা বত্রিশজন দেবকন্যা শাপমুক্ত হলাম।

আমরা দেবী পার্বতীর সখী ছিলাম। আমাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তিনি আমাদের শাপ দিয়েছিলেন—"তোমরা কাঠের পুতুলের মতো হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসনে লেগে থাক।" আমরা তাঁর পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগলাম। শেষে তাঁর দয়া হল। তিনি বললেন, "ঐ সিংহাসনে আগে রাজা বিক্রমাদিত্য বসে অনেক দিন ধার্মিক ভাবে প্রজা পালন করবেন। আরো অনেক দিন পরে ঐ সিংহাসন যখন ভোজরাজার হাতে আসবে, তোমরা তাঁকে বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা শোনাবে। তাহলেই তোমরা আবার আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে।" মহারাজ, এবার আপনার অনুমতি পেলে আমরা ফিরে যাই।'

পুতুলরা চলে গেলে, ভোজরাজ আর সিংহাসনে বসবার চেষ্টা করলেন না। ঐ সিংহাসনের উপর তিনি উমা-মহেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, রোজ ষোড়শোপচারে পূজো করতে লাগলেন।

—